KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশ চন্দ্র এ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫২/১ ৫২/২ ৫২/৩ ৫২/৪	Year of Publication বৈশাখ ১৩৯৮ // May 1991 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮ // Jun 1991 আষাঢ় ১৩৯৮ // July 1991 শ্রাবণ ১৩৯৮ // Aug 1991
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : আবদুর রহিম	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৩ জুলাই, ১৯৯১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলকাতার সমাজ, শিক্ষা, চিকিৎসা, সঙ্গীতচর্চা, নাট্যচর্চা, চিত্রকলা, সিনেমা ইত্যাদির হাল হকিকত নিয়ে জনসংখ্যাতত্ত্ববিদ এবং শিল্পইতিহাসবেত্তা অশোক মিত্রের গভীর পর্যবেক্ষণজাত নিবন্ধ "কলকাতার মানস"।

কেতকী কুশারী ডাইসনসূচিত ভিকতোরিয়া ওকাম্পোকেন্দ্রিক রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার গৌরী আইয়ুবকৃত পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশ।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত ড· দীনেশচন্দ্র সিংহের তথ্যসমৃদ্ধ সন্দর্ভ "বেসরকারি শিক্ষার পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর"।

মহামারীর স্বরূপ সন্ধানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে অগ্রসর হলে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে সেগুলিই প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিজ্ঞানী সুনীল সেনশর্মা।

"বাঙলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্বে চণ্ডীমণ্ডপ" নিবন্ধে এবারের আলোচ্য বিষয় চণ্ডীমণ্ডপের অবলুপ্তির ইতিহাস, সাম্প্রতিককালে এর পরিবর্তিত রূপ এবং চণ্ডীমণ্ডপ ইন্‌স্টিটিউশনে নিহিত সম্ভাবনা।

কলকাতার মূর্তি-ভাস্কর্য এবং বাঙলা ভাষায় কলকাতাচর্চা নিয়ে দুটি রিভিউ।

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ নিয়ে একটি বিশ্লেষণাত্মক তথ্যসমৃদ্ধ ভিন্নমত।

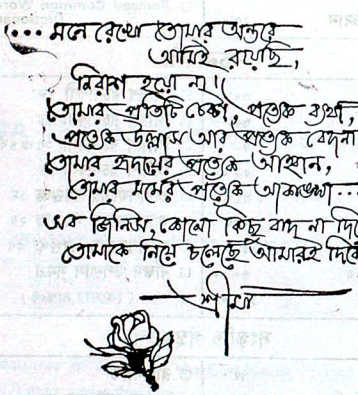

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ৩
জুলাই ১৯৯১
আষাঢ় ১৩৯৮

কলকাতার মানস অশোক মিত্র ১৮১
বেসরকারি শিক্ষার পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর দীনেশচন্দ্র সিংহ ১৯৯
মহামারীর স্বরূপ সন্ধান সুনীল সেনশর্মা ২০৫
রবীন্দ্র-গবেষণার একটি অভিনব ধারা গৌরী আইয়ুব ২২২

গোলাপগুচ্ছ সুরজিৎ ঘোষ ১৯৫
আততায়ী অরূপকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৬
অবচেতনায় নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার ১৯৭
ধবধবে জ্যোৎস্নায় শীতল চৌধুরী ১৯৮

নসিবিবির ঝুড়ি এ. মান্নাফ ২১৪

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ২৩০
বাঙলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্বে চণ্ডীমণ্ডপ অরবিন্দ সামন্ত

গ্রন্থসমালোচনা ২৩৮
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, গৌতম নিয়োগী, কান্তি গুপ্ত,
রণেন্দ্রনাথ দেব

মতামত ২৫৪
দীপক পিপলাই, শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রতীক বগাচী,
লোকেশ বিশ্বাস

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২১

While purchasing Hessian, Sacking, Yearn and Decorative Furnishing Fabrics & other Jute Products, please insist on quality product.

We are always ready to meet the exact type of your requirement.

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.

(*UNIT :* AUCKLAND JUTE MILLS)

"KANKARIA ESTATE"
6, Little Russell Street
Calcutta-700 071

Telephones : 29-2621
29-2623
29-7199
29-7698
29-7710

Cable : SWANAUCK, CALCUTTA
Telex : 21-2396 AUCK IN
Codes : BENTLEY'S SECOND

REGISTERED OFFICE & JUTE MILL AT JAGATDAL
24-PARGANAS, PHONES : BHATPARA 2757, 2758 & 2038

কলকাতার মানস

অশোক মিত্র

কলকাতার মানবসম্পদজগতে কী ঘটছে, বিশেষত অর্থোৎপাদনক্ষেত্রে, সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আগে অন্যত্র হয়েছে। সংস্কৃতি আর সামাজিক প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে কী ঘটছে, তার কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে

প্রথমেই শৈশব আর কৈশোরে শিক্ষাব্যবস্থার কথা ধরা যাক। ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল আর মাতৃভাষা-মাধ্যম স্কুলের মধ্যে নানাভাবে এক বিরাট পার্থক্য ক্রমশ বাড়ছে কয়েকটি কারণে, যার ফলে মাতৃভাষায় শিক্ষায়তনগুলি উচ্চ-মানের তো নয়ই, সাধারণ-মানের শিক্ষাও দিতে অসমর্থ হচ্ছে। সেগুলি মুখ্যত এই : মাতৃভাষা-মাধ্যম স্কুলগুলিতে শিক্ষার আনুষঙ্গিক উপকরণ আর যন্ত্রপাতির অভাব এবং সেগুলির ব্যবহারে অবহেলা। তার সঙ্গে অন্যান্য উপযোগী ব্যবস্থা আর পরিবেশের অভাব, যথা—লাইব্রেরির, পরীক্ষাপাঠ্য বইয়ের বাইরে নানা ধরনের, নানা বিষয়ের বই পড়ার সুযোগ আর ইচ্ছার লোপ, শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনার সুযোগের অভাব, মাস্টারমশাইদের মাইনে আর সুখসুবিধার ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা। অন্যদিকে, মাস্টারমশাইদের কর্তব্যে অবহেলা এবং তার সঙ্গে নানা অবৈধ উপায়ে রোজগারের অবাধ বৃদ্ধি, ক্লাসঘরের অকুলান আর স্বল্প অস্বস্তিকর আয়তন ; এক ক্লাসে ছাত্রছাত্রী-ভর্তির সংখ্যাসীমা বেঁধে দেওয়ায় অবহেলা, শিক্ষক-ছাত্রের হারাহার রক্ষার অভাব। সরকারি, এমনকী বেসরকারি স্কুল-গুলিতেও শিক্ষকদের জীবনে আর কাজে অনুশাসনের, নিষ্ঠার, বিবেকের আর দায়িত্ববোধের অবনতি। এই ধরনের পার্থক্যে এবং মাতৃভাষার স্কুলগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থার নানা বিপাকে, আমাদের মাতৃভাষাভিত্তিক স্কুলগুলিতে, যেখানে আমাদের দেশের বৃহত্তম, জীবতত্ত্বের ভাষায়, মধ্যবিত্ত জীন (gene)-ভাণ্ডার নিহিত, সেটি দ্রুত অবক্ষয়ের পথে চলেছে। এর সঙ্গে যোগ করুন প্রতি সন্ধ্যায় গরিব বা অল্পবিত্ত ঘরে অহরহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুতের অভাব, যার ফলে সেইসব বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা পড়াশোনা মাথায় ওঠে, অথচ সে সময়ে বিত্তশালীদের ছেলেমেয়েরা জেনারেটর বা ইনভার্টারের জোরে পড়াশোনা করে। ভেবে দেখুন—বিজলির অবস্থা যদি এরকম আরো দশ বছর চলে, তা হলে সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের তুলনায় একদম মাটিতে গড়াগড়ি খাবে। এখনই তো সারা ভারতে ১৯৫১ সালের

দ্বিতীয় স্থান থেকে সতেরো স্থানে নেমে গেছে। অথচ স্কুলের একস্তর থেকে ইংরেজি-মাধ্যমে শিক্ষা নিতান্ত অপরিহার্য, যদি আমরা দুটি পরস্পর-বিরোধী ভারতের অভিশাপ থেকে উদ্ধার পেতে চাই। এক ভারত, যাতে দেশের তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষা পাবে, ফলে সাক্ষরতা এবং শিক্ষা সত্ত্বেও বিশ্বের প্রগতির দ্বার তার পক্ষে মোটামুটি থাকবে রুদ্ধ। দ্বিতীয় ভারত, যার এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যাকে বিশ্ববাসী ইনডিয়া বলে জানে, যে বিশ্বজ্ঞানের ভাণ্ডারে বিচরণ করে জ্ঞান আহরণ করবে। ইংরেজি আজ বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানের চাবিকাঠি, তা কোনো দেশের একক সম্পত্তি নয়। তাকে উপেক্ষা করা আত্মহত্যার সমান হবে। উপরন্তু, আমাদের যদি সর্বভারতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়, তাহলে তৃতীয় একটি ভাষাও অপরিহার্য, সেটি হিন্দি। সংস্কৃত থেকেও হিন্দি আজ ভারতের সকল সমাজে প্রবেশের চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের প্রতি রাজ্যেই যে-কোনো কর্মে নিযুক্ত মানুষের পক্ষে অন্তত তিনটি ভাষায় জ্ঞান নিতান্ত কাম্য, অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। যাঁদের হিন্দি মাতৃভাষা তাঁদের আরেকটি ভারতীয় ভাষা শিখতে হবে। এ বিষয়ে সকলেই মনে-মনে একমত, মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক কোন্ বয়সে, বিদ্যালয়ের ঠিক কোন্ মান থেকে—সে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক যাই হোক—এই তিনটি ভাষার এক-একটি শুরু হবে। একেবারে প্রথম সোপানে মাতৃভাষা—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু কোন্ সোপানে ইংরেজি আসবে, এবং পরে কোন্ সোপানে হিন্দি আসবে, সেই নিয়ে-আসা উচিত, দেশময় আলোচনার পর সকলের সম্মতি-ক্রমে একটি অনড় সিদ্ধান্তে। এই সিদ্ধান্ত তখনই সর্বজনগ্রাহ্য হবে যখন দেশময় প্রতি রাজ্যে সর্বস্তরে রীতিমতো আলোচনা করে সবদিক বিচার শেষ হবে। দ্বিতীয়ত, সেই সঙ্গে শিক্ষকের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, বিদ্যায়তনে শিক্ষার সরনজাম ও ব্যবস্থার সর্বত্র একটি সমতা আসবে এবং শিক্ষকদের অজ্ঞতা, অরাজকতা, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা কঠোর হাতে দূর করতে না পারলে শত সদিচ্ছা এবং টাকা ঢালা সত্ত্বেও দেশ নিরক্ষরতা আর অজ্ঞানের অন্ধকূপেই থেকে যাবে। শুধু নীতিগ্রহণ করলেই হবে না, দেশের সর্বত্র শিক্ষকরা যাতে এই নীতি পালনে সক্ষম হন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো প্রকারে শুধু সাক্ষরতা অভিযানে—সে যত চোখধাঁধানোই হোক—দেশের উন্নতি ও সার্থকতা সম্ভব হবে না। প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শিক্ষার বুনিয়াদ পাকাপোক্ত না হলে দেশের জন-সংখ্যা সমস্যা, অকালমৃত্যু, স্বাস্থ্যের উন্নতি, উন্নত মানের প্রযুক্তি ও উৎপাদন, দেশের ধনবৃদ্ধি, জীবিকার উন্নতি, নারীদের স্বাধীন জীবিকা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, দেশের পক্ষে আধুনিক যুগে প্রবেশ—কোনোটাই সম্ভব হবে না।

শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উঁচুমানের ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের দেশ উদ্ধার হবে, এমন প্রমাণ তো পাই না বরং তার উলটোটাই পেয়েছি। গত পনেরো বছরে ডুন-স্কুলের ইংরেজিশিক্ষাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি আর নেতৃত্ব আমাদের দেশকে কোন্ অবস্থায় এনে ফেলেছে, তা স্বচক্ষে দেখেছি। অথচ এই পনেরো বছরের আগের পনেরো বছরে শান্তিনিকেতন-লালিত নেত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশকে কত আত্ম বিশ্বাস ও মর্যাদামণ্ডিত করেছিল ভেবে দেখুন।

উচ্চশিক্ষার জগতে

এ তো গেল প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শিক্ষার কথা। সবথেকে বেশি ক্ষতি হচ্ছে উচ্চশিক্ষা আর গবেষণার। যাদবপুর আর কলকাতা—এই দুটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় সারা ভারতের শিক্ষার মানচিত্রে এখনও কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মান রেখেছে। যদিও, ইদানীং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে যে-প্রসিদ্ধি ছিল, তার কিছুটা খর্ব হয়েছে। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রছাত্রীদের এবং বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে যাঁরা গবেষণারত থাকেন ভারতের তথা পৃথিবীর অন্যান্য বিদ্যাক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট কদর আছে। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে আর যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যেমন, উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান, মেদিনীপুর, কল্যাণী—তারা ভারতের অগ্রগণ্য ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান পাবে কিনা সন্দেহ। দুঃখের বিষয়, খড়গপুর ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজি বা জোকার ইনস্টিটিউট অভ ম্যানেজমেনটের স্থান ভারতের অন্য কয়েকটি ওই-নামীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কিছুটা পড়ে গেছে। সাহিত্য, দর্শন-জাতীয় ক্ষেত্রে অথবা উচ্চস্তরের শুদ্ধ বা ফলিত বিজ্ঞানে বা প্রযুক্তিতে যাঁরা বিশেষ নাম করেছেন, তাঁদের পক্ষে আরো উচ্চমানের গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ, মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া, খুবই কম আছে। সবথেকে মুশকিল, ভারতের অন্যত্র অথবা বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের সঙ্গে একক বা গোষ্ঠীগত আলোচনার ক্ষেত্র বেশ সঙ্কুচিত হয়েছে। খুবই কমসংখ্যক বিশিষ্ট পণ্ডিত আজকাল কলকাতায় আসেন। সকলেই জানেন, আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত এবং নিয়মিত চালু না থাকলে গবেষণার মাথা খুলতে চায় না। ফলে, এখানকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা গবেষণার সন্ধানে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হন। উপরন্তু, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো, পশ্চিমবঙ্গও তার প্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্য প্রদেশ থেকে শিক্ষক বা গবেষক আনার পথে অনেক অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। সবথেকে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন শিক্ষকরা নিজেরা, পাছে নিজেদের জমিদারিগুলি হাতছাড়া হয়, ভবিষ্যতে চাকুরিতে বিনাপরিশ্রমের উন্নতিতে পাছে বাইরের লোক এসে বাদ সাধে। কর্তৃপক্ষও শিক্ষার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁদের পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে থাকেন। সারা রাজ্যে এখন খুব কমই অবাঙালি গবেষক বা অধ্যাপক আছেন। যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই নিতান্ত অস্থায়ী। ফলে, আমাদের শিক্ষকতার মানের ক্ষতি হচ্ছে। তার কারণ: আমারই তুলনা আমি এ কূপগহ্বরে এবং আমার উৎকর্ষ মাপার পথে বাইরের কোনো নৈর্ব্যক্তিক মাপকাঠির আমদানি আমরাই রোধ করেছি।

শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে

এই প্রসঙ্গে ১৯৫৬ সালের দু-একটি কথা মনে পড়ছে। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বড়ো, ছোটো কুটীর-শিল্প, সমবায় ও মৎস্য বিভাগে সেক্রেটারির কাজ করি। তার কিছু আগে বিধানচন্দ্র রায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আর ত্রিগুণাচরণ সেনকে খড়গপুরের আই-আই-টি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে সে দুটি শ্রেষ্ঠ মানের প্রযুক্তি তথা ফলিত বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। সেই সঙ্গে তিনি শিবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজে অতুলচন্দ্র রায়কে অধ্যক্ষপদে আনলেন যাতে কলেজটি নতুন কয়েকটি বিভাগ খোলে। একই সময়ে তিনি কেন্দ্রের কাছে আবেদন করলেন যাতে দুর্গাপুরে এনজিনিয়ারিং বিষয়ে একটি উচ্চমানের গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। আমার বিভাগ-গুলিতে আমরা চেষ্টিত হলুম যাতে নতুন-নতুন শিল্প-উপনগরী প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেগুলি পার্শ্বস্থ বড়ো-বড়ো কারখানাগুলিতে মাঝারি আর ছোটো যন্ত্রপাতি এবং বড়ো-বড়ো কলকব্জার ছোটো বড়ো অংশ তৈরি করে সরবরাহ করতে পারে, এবং এইসব সরবরাহের ঠিকাদারি পায়। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বি. সি. মল্লিক, এন. কে. বিশ্বাস, উদয়ন চ্যাটার্জি ও আমাকে ১৯৫৬ সালের শেষে জাপান পাঠালেন, সেখানে কিভাবে মাঝারি আর ছোটো কারখানার পত্তন করে এইসব শিল্প-উপনগরী গড়ে তুলতে পারা যায়, তাই দেখে আর শিখে আসতে। মল্লিক আর তাঁর সহকর্মীরা ফিরে এসে কল্যাণী, দুর্গাপুর আর দাশনগরের শিল্প-উপনগরীর পত্তনের উদ্যোগে মেতে গেলেন। সেই সঙ্গে জাপানি শিল্পের সহযোগে হাওড়া শহরে ক্ষুদ্র এনজিনিয়ারিং শিল্পের সাহায্যার্থে একটি ইনস্টিটিউট

প্রতিষ্ঠিত হল।

কী ধরনের সুদূরব্যাপী দৃষ্টির ফলে এইসব প্রচেষ্টার সূত্রপাত হল, তা বুঝতে পারলুম যখন মল্লিক আর আমি একদিন ডা. রায়ের কাছে কেন্দ্রের দুটি নীতির সপক্ষে রায় দেবার হেতু তাঁকে প্রায় অভিযুক্ত করলুম। সে দুটি নীতির একটি হচ্ছে শিল্পনীতি বিষয়ে ১৯৫৬ সালের পরিবর্তিত দ্বিতীয় ঘোষণার বিরুদ্ধে (প্রথম ঘোষণা হয় ১৯৪৮ সালে)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিশেষ কয়েকটি কাঁচা ও তৈরি মালের, যা মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গে বা নিকটস্থ বিহারে তৈরি হয়, তাদের সারা ভারতে মূল্যসমীকরণ নীতির বিরুদ্ধে। সে সময়ে এবং তার অনেক বছর পর পর্যন্ত আমি ভারতের শিল্পোন্নতি ও দেশবাসীর মঙ্গলকল্পে পাব্লিক সেক্টরের অগ্রগণ্য কাম্যস্থান বিষয়ে একান্ত বিশ্বাসী ছিলুম। ১৯৬০ সালের পর আমি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত স্বচক্ষে কিছু-কিছু দেখলুম, তখন বুঝলুম পাব্লিক সেকটরের একচেটিয়াত্ব কতখানি ক্ষতিকর হতে পারে; সঙ্গে-সঙ্গে সরকারও দেশের মঙ্গল বিষয়ে কত উদাসীন হতে পারে। তখন আমি আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছি। তবে বিধানবাবুর কথার মর্ম আমি ভালো করে বুঝতে পারি ১৯৮৬ সালে পেরেস্ত্রোয়িকা আন্দোলন শুরু হবার পর।

মূল্যসমীকরণ সম্বন্ধে ডা. রায় আমাকে আর মল্লিককে আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে কাজ করার ইতিহাসকে ইঙ্গিত করে সহাস্যে একহাত নিলেন। তিনি বললেন,

> অশোক, আর তুমি খুচু (মল্লিকের ডাকনাম), তোমাদের মনে রাখা উচিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক সম্পদের ভোগোলিক কারণে এতদিন এক অন্যায্য সুবিধা ভোগ করে এসেছে। কলকাতা আর পূর্ব-ভারত ব্রিটিশ শিল্পের ঘাঁটি ছিল বলে ব্রিটিশরা এই অঞ্চলের কাঁচামাল আর খনিজ-পদার্থের উপর তাদের নিজেদের সুবিধামত দাম নির্ধারণ করে। সেগুলি এতদিন বহাল থাকে। ব্রিটিশরা নিশ্চয় চায় নি, ভারতের অন্যান্য স্থানে, বিশেষত বম্বেতে, যেখানে এখানকার মতো তাদের শিল্পাধিপত্য ছিল না, সেখানে দেশীয় শিল্পপতিরা ব্রিটিশদের এই সুবিধা সমানভাবে ভোগ করে, তাদের এক-চেটিয়াত্বে হাত পড়ে। এই কারণেই কলকাতা বন্দরকে সুবিধা দেবার জন্যে তারা রেলবহনে টেলিস্কোপিক দর ঠিক করেছিল, যার কল্যাণে তাদের আধিপত্যের কলকাতা বন্দর, তথা কলকাতাস্থিত ইংরেজ কোম্পানিগুলি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে সুবিধা পায়। এইসব কারণেই তারা এই অঞ্চলের কাঁচা ও খনিজ মালের দাম সমীকরণের আবেদনে 'না' বলে এসেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমার যা ভূমিকা ছিল, সে সত্ত্বেও তোমরা কি চাও যে, শুধু কলকাতাকে খাতির করার জন্য আমি সারা দেশের বিরুদ্ধে সেই হানিকর ব্রিটিশ নীতির সমর্থন করব? কলকাতাকে এই অন্যায় সুযোগ দিয়ে আমার রাজ্যের চার-পাশে স্থানীয় স্বার্থের টানে পাঁচিল কায়েম রাখব? তাতে কি সারা ভারতের ক্ষতি হবে না? পশ্চিম-বঙ্গকে এই ধরনের একান্ত স্বার্থপর সুবিধা ত্যাগ করতেই হবে। তার ফলে যে ক্ষতি হবে, পশ্চিম-বঙ্গকে তা অন্যভাবে অতিক্রম করতে হবে। হাওড়া এবং ভাগীরথীর দু-পারে যেসব পুরনো প্রযুক্তির লোহালক্কড়-ভরা কারখানা আছে, সেগুলি মূলত কায়িক শ্রমের ওপর চলে, যে কায়িক শক্তি সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসীর নেই। সেগুলি দূর করে তাদের স্থানে আস্তে-আস্তে নতুন আধুনিকপ্রযুক্তিগত শিল্পকারখানা বাড়াতে হবে, যাতে শিক্ষিত মজুররা পেশীর উপর নির্ভর কম করে বুদ্ধি আর দক্ষতা নিয়ে আধুনিক মানের বেশি ভ্যালু-অ্যাডেড মাল তৈরি করতে পারে। বাঙালি মজুরের মুটেগিরির শক্তি না থাকলেও, দক্ষতায় সে শক্তি রাখে, তার মন শিক্ষাভিমুখী,

সে চট করে জটিল জিনিস আয়ত্ত করতে পারে। তার দক্ষতা, জ্ঞান আর শিক্ষা যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ে, তার জন্যই না আমরা এতগুলি কলেজে আর নতুন প্রযুক্তি সংস্থায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। বাঙলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে নতুন বিদ্যা, নতুন দক্ষতা শেখার ওপর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুরনো কারখানার কঙ্কালগুলো আঁকড়ে থাকার ওপর নয়।

এর থেকে আমরা আসল প্রশ্নে আসতে পারি। কোনো দেশের বা জাতির সব সমৃদ্ধির শীর্ষে থাকে তার সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি। সেই সমৃদ্ধির নীচের তলায় থাকে তার আর্থিক, শিল্পগত, কারখানাগত, পরিশ্রম-ও দক্ষতাগত, বাণিজ্যগত, পুঁজিগত জাগতিক ও পারিবারিক জীবনধারণের সমৃদ্ধি—যার পরিপূর্ণভাবে জোগান দেয় বিজলি, রাস্তাঘাট, যানবাহন, পণ্য, পাইকারি আর খুচরো ব্যাবসা, নানাবিধ আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশে নীচের তলার সম্পদক্ষয়ের দরুন আমাদের শীর্ষ সমৃদ্ধি কি আগের মতো সারা দেশের সঙ্গে সমান-সমান ভাবে আদানপ্রদান করার ক্ষমতা রাখবে, উপরন্তু আগের মতো কিছুটা এগিয়ে থাকবে অনেক ব্যাপারে?

সাহিত্যের জগতে

আমাদের এখনও একটি গর্ব আছে। কলকাতার বইমেলাগুলিতে বিক্রি ভারতের অন্য সব মেলার থেকে বেশি। তাতেই ছাপার অক্ষরের প্রতি কলকাতাবাসীর কত টান বোঝা যায়। বিশেষত কলকাতাবাসীর গড় আয় যখন ভারতের প্রধান-প্রধান শহরবাসীর আয়ের থেকে বেশ কম। বই বিক্রির মধ্যে একটি কথা থেকে যায়। যত বই বিক্রি হয়, তার মধ্যে নানা মৌলিক জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষত নতুন-নতুন জ্ঞানের জগতের সন্ধান দিয়ে যেসব বই প্রকাশিত হয়, তাদের বিক্রি মেলার সারা বিক্রির ভগ্নাংশমাত্র হয়। বাঙলা বা অন্য ভাষায় যেসব মৌলিক রচনার বই বিক্রি হয়, তার সম্বন্ধে অনেক কিছু অভিযোগ ইদানীং জমে উঠেছে। প্রথমত, যে-কোনো লেখকের লেখকজীবনে মৌলিক বা নতুন সৃষ্টির কাল কয়েক বছরের বেশি স্থায়ী হচ্ছে না। অধিকাংশ সময়ে বড়ো জোর প্রথম আট বা দশ বছর। তার পরেও যদি লেখেন তা নিতান্ত অভ্যাসবশে, বই বিক্রির তাগিদে। খুব কম লেখকই আছেন যাঁদের পঞ্চাশ বৎসর বয়সের লেখা নতুন সৃষ্টির মহিমায় উজ্জ্বল, যা নাকি পাঁচের দশকে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত প্রৌঢ় লেখকেরই ছিল। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, শিল্পী, গায়কের কাজ প্রথম প্রতিশ্রুতির কিছুদিনের মধ্যে কেমন যেন এলিয়ে যায়, পুনরাবৃত্তি বা রকমফের মাত্র হয়, ভুয়ো গর্ভধারণের মতো।

এই অবস্থার কতকগুলি কারণও থাকে। কলকাতা আর পশ্চিমবঙ্গের দীন পরিবেশে লেখকের জগৎ ক্রমশ শীর্ণ, রক্তহীন হয়ে আসছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামান্য-সামান্য জিনিসের অভাব ক্লান্তি- ও বিরক্তি-কর হয়ে পড়ে। পরিবেশও এত খারাপ হয়েছে শরীর সুস্থ রাখাই দুষ্কর। কলকাতার মধ্যেই আরামে বা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করে, পরিচিতদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, সভাসমিতি-বিতর্কসভায় যোগদান, পড়া-শোনা চিত্তবিনোদন তাজা রাখা বাঙালির পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। মনকে তাজা রাখা সমৃদ্ধ করা শক্ত। বাঙালি অন্যান্য ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করার ব্যাপারে, এমনকী রাষ্ট্রভাষা হিন্দি শেখার ব্যাপারেও, পটু তো নয়ই, উলটে অন্য ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে উদাসীন, নাক-সেঁটকানো ভাব আছে, ভাবখানা ওদের ভাষায় আর কী আছে। এই মিথ্যা দম্ভ আর উন্নাসিকতার ফলে ভারতের অন্যসব সাহিত্য দ্রুতবেগে—বিশেষত সেসব রাজ্যে দ্রুত শিক্ষার প্রসারের দরুন—এগিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে সেসব ভাষার নয়, ক্ষতি হচ্ছে বাঙালি মনের আর দৃষ্টিভঙ্গির। দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজে আমি

বহু বাঙালি পরিবারকে জানি যাঁরা বছরের পর বছর ওইসব শহরে কাটিয়েও স্থানীয় ভাষা না পারেন বলতে, না পড়তে—সাহিত্য তো দূরের কথা। বরং তাঁদের অক্ষমতা নিয়ে তাঁরা বড়াই করেন, ঠিক যেমন এখন কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাঙলা জানে না বলে যখন মা-বাবারা বড়াই করেন। অথচ দেখুন—কলকাতায় মাত্র কয়েক মাস বাস করছেন এমন অবাঙালি পরিবার অজস্র আছেন যাঁদের সকলে বাঙলা ভাষায় ভালো করে কথাবার্তা বলতে পারেন, বাঙলা কাগজ পড়েন। এইভাবে ভারতের মতো বৃহৎ একটি সৃষ্টির ভাণ্ডার বাঙালিরা নিজের দোষে অগম্য রেখেছেন। তৃতীয়ত, ভারতের বাইরে যেসব লেখক, বৈজ্ঞানিক, মনীষী আছেন, আজকাল কলকাতায় তাঁদের খুব কম অংশই আসেন। এলেও দু-একদিনের বেশি থাকেন না। স্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ পান না, যা অন্য ভারতীয় শহরে আজ অনেক বেশি সম্ভব হয়। যখন কলকাতায় আসেন তখন কলকাতাবাসীর অহঙ্কারে শুড়শুড়ি দেবার জন্যে এ-শহরের কপট প্রশংসা করেন, কিন্তু কলকাতা এড়িয়ে যাওয়াতেই তাঁদের প্রীতির পরিচয় বেশি পাওয়া যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শরীরে মিশ্র রক্তের মতো, ভিন্ন জগতের মনের সঙ্গে আদানপ্রদান না হলে মনের প্রসার হয় না, সেই সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে ধারণা অযথা স্ফীত হয়। সম্ভবত সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন অন্তর-অন্তর দেশের বাইরে কিছুদিন থেকে দেখেশুনে মন আর চিন্তাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে অত ব্যস্ত হতেন। আজকালকার লেখকরা 'ফোরেন' থানাপিনা ও ফেরার সময়ে 'ফোরেন' মাল আনার জন্যে ব্যস্ত হন, নিজ-গৃহে যে-সবের, সরকারের কল্যাণে, নিত্য অভাব। বাঙালি এখনও অক্লান্ত ভবঘুরে। ভারতের সর্বত্র তাদের দেখবেন। এমনকী দক্ষিণ আমেরিকার কুমেরুর কাছে কেপ হর্ন অন্তরীপে আপনি যদি দেখেন দূরে সমুদ্রের ধারে, সারা শরীর ছুটভুটে রঙের এক প্রকাণ্ড 'আলো-স্টারে' আর যার মাথা ডবল মাংকি ক্যাপ আর মোটা 'কম্ফর্টারে' মুড়ে একা কোনো লোক আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে সিদ্ধুঘোটক-গুলিকে মাছ ছুঁড়ে-ছুঁড়ে খাওয়াচ্ছে, তাহলে অনায়াসে আপনি ধরে নিতে পারেন লোকটি বাঙালি। তা সত্ত্বেও ঘরে ফিরে এসে তিনি সারা পৃথিবী ভুলে গিয়ে তাঁর কূপমণ্ডুক বাঙালি অস্তিত্ব দ্বিগুণ উৎসাহে জাহির করবেন। ভ্রমণের সার্থকতা থেকে মনকে উপবাসী রাখেন, ফলে আসে আত্মকরুণা, ঘরকুনো মনোবৃত্তি, সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে অভিযোগের মনোভাব।

নাট্যমঞ্চে

যে রঙ্গমঞ্চ, নাট্যজগৎ, নাট্যকার নিয়ে কলকাতা-বাসীর দু-শ বছরের এত গর্ব সেখানেও যেন অবক্ষয় শুরু হয়েছে। প্রথমত নাটকের বিষয়ে, বক্তব্যে, অভিনয়রীতিতে রঙ্গমঞ্চের সজ্জায় নতুন কিছু প্রবর্তনে যেন যথেষ্ট দ্বিধা থাকে। অনেক সময়ে পুরনোকে নতুন মুখোস পরিয়ে চালানোর প্রয়াস হয়, অথবা নতুন কোনো চিন্তা বা বক্তব্যকে পুরনোর মুখোস পরিয়ে। খুব কম ক্ষেত্রেই নতুনকে নতুন বেশে চালানোর সাহস হয়। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। স্ত্রীদ্বাধীনতা সম্বন্ধে শাঁওলী মিত্র "নাথবতী অনাথবৎ" আর "কথা অমৃতসমান" মঞ্চস্থ ও অভিনয় করে দ্রৌপদীকে নতুন আলোয় দেখিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজনহয়েছেন। তবে দুটি নাটকই অতীতের কাহিনী আশ্রয় করে অতীতে গিয়ে নিজের আধুনিক বক্তব্য বলছে। এর আধুনিক প্রকাশ আমাদের বর্তমান সমাজে বহুলভাবে দেখি : কেমন-ভাবে একটি নারী নিজেকে নিতান্ত দাসীত্বে পরিণত করে শ্বশুরবাড়ির সবকিছু ভরণপোষণ মিটিয়ে এমন-কী গোপনে বাপের বাড়ির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে নিজে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতার, এমনকী একটি

পয়সা খরচ করার স্বাধীনতা না পেয়ে সর্বত্র পদানত হয়ে আছে, উপরন্তু পুত্র, স্বামী, দেবর, শ্বশুরের যত কিছু আবদার অত্যাচার নীরবে সহ্য করছে। অন্ত-পক্ষে একই বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাট্যকার আবদুল্লা-অল-মামুন নাটক লিখলেন "কোকিলারা", সেটি মঞ্চস্থ করলেন ফিরদৌসি মজুমদার। বিষয়টি বাংলাদেশী সমাজের তিনটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরের তিনটি মহিলার একেবারে আজকের সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত। ভাষা ও বাচনও আঞ্চলিক ও সমাজের স্তরানুযায়ী টানে একেবারে মুচমুচে তাজা। কলকাতায় শম্ভু মিত্রের পরে এমন কারো নাম সহজে মনে পড়ে না যিনি রঙ্গমঞ্চসজ্জায়, নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব আর বক্তব্যের নতুন ব্যাখ্যায় সবকিছু মিলিয়ে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেছেন, যেমন করেছেন ধরুন মণিপুরের রতন থিয়ম। ২৭শে এপ্রিল ১৯৯১-এর "দেশ" পত্রিকায় রবিশংকর বল ও রতন থিয়মের কথোপকথনের অনুলিপি বেরিয়েছে। রতন থিয়ম যে গভীরভাবে অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়েছেন, বিশ্বকে মণিপুরের অন্তঃপুরে এনেছেন, নিজের চিন্তা-ভাবনাদর্শনকে যে উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়ে তিনি তা সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তার গভীরত্ব সৌকর্য ইদানীং কোনো বাঙালি অভিনেতা বা মঞ্চকারের বক্তব্যে দেখি নি। ব্রেশ্‌টের পদানুসরণ করে বাদল সরকার যে নতুনভাব ও আঙ্গিকের প্রবর্তন করলেন বলে আমরা দাবি করি, তার তুলনায় ইব্রাহিম আলকাজি বছর পঁচিশেক আগে যেভাবে "ককেশিয়ান চক সার্কল" স্থানীয় ভাষায় দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অভ ড্রামায় মঞ্চস্থ করেন, তার 'অভিনবত্ব আমার কাছে আরো মনোজ্ঞ হয়েছিল। নাটকের ভাষা, ভাব, বক্তব্য মঞ্চস্থ করার রীতি এবং আঙ্গিকে কল্পনা আর অভিনবত্বে কলকাতার লেখক আর রূপকাররা মণিপুর, ত্রিবান্দ্রম, বম্বে বা দিল্লীর তুলনায় পিছিয়ে আছেন বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরুন রতন থিয়ম, লোকেন্দ্র আরম্বম, পানিক্কর, এলকুঞ্চুর, তেন্দুলকর, আলকাজি, হাবিব তন্‌ভীর বা সর্দার হাশমি। তাঁরা যে সাহস ও কল্পনাবশে নতুন-নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছেন, তার তুলনায় আমাদের শিল্পীরা টুকে পরীক্ষায় পাশ করছেন বলা যায়। দিল্লী, বম্বের দূরদর্শনের নাটকের তুলনায় কলকাতার দূরদর্শনের নাটক অনেক সময়ে অসহ্য মনে হয়।

সংগীতের জগতে

ষাট সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় লাভ করতেন না, যতক্ষণ না তিনি শীতকালে কলকাতার সঙ্গীতসম্মেলনে এসে এখানকার শ্রোতাদের সাধুবাদ পেতেন। ১৯৬৫ সালে আমি কার্যগতিকে একবার কাবুল যাই। তখন রমজান চলছে। আমার স্থানীয় বন্ধুরা ইফতার আহারের পর আমাকে একের পর এক গানের মজলিসে নিয়ে যান। কলকাতার অতি প্রিয় সুবিখ্যাত ওস্তাদ সারা হাঙকে এক মজলিসে পেলুম, মালকোষ ধরেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে একজন তাঁর কানে-কানে বললেন একজন কলকাতার মেহমান এসেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মালকোষ থামিয়ে একটি সুন্দর ভাটিয়ালি গেয়ে আমার নমস্কারের প্রত্যুত্তরে আমার দিকে হাত তুলে আদাব দিয়ে, যেখানে মালকোষ ছেড়েছিলেন সেখান থেকে শুরু করলেন। গর্বে আমার বুক দশ হাত ফুলে গেল। ১৯৬৫ সালে সঙ্গীতজগতে কলকাতার স্থান কত উঁচুতে ছিল, তাই বলতে ঘটনাটির উল্লেখ করলুম। কলকাতার স্থান এখন অধিকার করেছে ভারতের অন্যান্য শহর।

চলচ্চিত্রের জগতে

পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফিল্মের কথায় আসার আগে দূরদর্শনের ছোটো ফিল্মের কথাই বলা যাক। আগেও সামান্য বলেছি। লোডশেডিঙের জ্বালায় কিছু দেখা শক্ত।

তবু যে কটি দেখেছি তাতে মনে হয় নতুন মিডিয়ামের উপযুক্ত ছোটো আখ্যানে সিনেমাটোগ্রাফির যেসব আঙ্গিক, গুণ বা লক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়, তার বদলে টি-ভিতে অধিকাংশ সময়ে রঙ্গমঞ্চের নীতি অনুসরণ করা হয়, এমনকী অতীতের রঙ্গমঞ্চের 'নাটকীয়' বাচন আর অভিনয় -ভঙ্গিকেও। একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের প্রেমচাঁদের গল্প "সদগতি"র কথা মনে গেঁথে আছে, তার জন্য দায়ী বোধ হয় মুখ্যত স্মিতা পাটিল আর ওম পুরী। তা ছাড়া, প্রেমচাঁদের গল্পের স্যাকামি-বিরোধী রুক্ষতা।

ফিল্ম সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ১৯৫৩ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। মহীশূর থেকে বাঙ্গালোরে একটি যাত্রীবাসে আসছি। আমার পাশে বসা ভদ্রলোক আমার মুখে মহীশূর রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর কানাড়িদের সভ্যতা-ভব্যতার প্রশংসা শুনে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোথাকার লোক। ভেবেছিলেন আমি সিংহলী অথবা নেপালী বা জাপানি। আমি যখন বললাম আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী হয়তো কোন কালে জাপানে গিয়েছিলেন কিন্তু আমি বাঙালি, ভদ্রলোক আমার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—বেঙ্গল? জান, তারা ভারতে তোমার দেশ হচ্ছে সংস্কৃতির দেশ আর কী সুন্দর। বলেই বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ প্রভৃতি দশ-বারো জন ঔপন্যাসিকের নাম করলেন। তার তুলনায় অনেক কষ্টে আমি মাত্র তিনজন কানাড়ি সাহিত্যিকের নাম করতে পারলুম, এমনই বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিধি! বললেন: এঁদের লেখা আমি গোগ্রাসে পড়ি। তোমাদের ফিল্ম থেকে আমি তোমাদের ও তোমাদের দেশকে চিনি। তোমাদের নিউ থিয়েটার্স ভারতের গর্ব, বিশুদ্ধ আর্ট, তাছাড়া একটি পুরো আঞ্চলিক সভ্যতার পূর্ণ পরিচয় দেয়, বাঙালি চরিত্রের নরম ভাব আর নিষ্ঠা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করে। প্রভাত সিনেমা ধারেকাছে লাগে না। জেমিনি তো অনুপাতে জঘন্য, কেবল নারী-দেহ আর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি। আমার তখন মনে পড়ল ছাত্রাবস্থায় আমার ইংরেজ বন্ধুরা বলতেন, পরে ফরাসিদের কাছেও শুনেছি, ফরাসি ছবি থেকেই ফরাসিরা যেরকম সার্বিক তৃপ্তি ও আত্মিক যোগের আস্বাদ পায় অন্য দেশের ছবি থেকে তা পায় না। ইদানীং শনি-রবিবারে কলকাতা দূরদর্শন যখন মাঝে-মাঝে নিউ থিয়েটার্সের পুরনো ছবি দেখায় তখন মহীশূরী ভদ্রলোকের কথার সার্থকতা বুঝতে পারি। তবে নিউ থিয়েটার্সের অধিকাংশ ছবি শেষ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চের ধাঁচে আর আঙ্গিকে গড়া, সবসময়ে আধুনিক সিনেমাটোগ্রাফির দর্শন- আর আঙ্গিক-সম্মত নয়। সেই হিসাবে সিনেমাটোগ্রাফির আঙ্গিক বোধহয় সর্বপ্রথম কিছুটা আনলেন নিমাই ঘোষ তাঁর "ছিন্নমূল" ছবিতে। সব হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" প্রথম বাঙলা ছবি যা নাকি মূলত নিউ থিয়েটার্সের আত্মিক সত্তাকে—যার সঙ্গে বিভূতি-ভূষণের নিজের কোনো বিরোধ ছিল না, এবং যা এই ক্রান্তি সুগম করে—আধুনিক সিনেমাটোগ্রাফিক শিল্পের নিজস্ব রূপ, আইন ও আঙ্গিকের জগতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"র মতো "পথের পাঁচালী"ও এক নতুন জগতের সন্ধান দিল। অবশ্য "পথের পাঁচালী" সন্ধান দিল দৈনন্দিন আপাত দীনাতিদীন মানব অবস্থার গহনতম গভীরতার। কিন্তু নতুন শিল্প, নতুন সাহিত্য ও আধুনিক মানবিক রসের সন্ধান দিলেন মুখ্যত ঋত্বিক ঘটক তাঁর "অযান্ত্রিক", "মেঘে ঢাকা তারা", "সুবর্ণ-রেখা"য়। তার কিছুদিন পরে আরেক দিকপাল এলেন হরিসাধন দাশগুপ্ত তাঁর "একই অঙ্গে এত রূপ"-এ। দুঃখের বিষয়, হরিসাধন সৃষ্টিজগতে বেশি দিন বিরাজ করলেন না, কিন্তু ঋত্বিক ঘটক কয়েক বছর পরে আবার দর্শককে চমকিয়ে দিলেন তাঁর "যুক্তি, তক্কো, গপ্পো"। যেমন আঙ্গিকে তেমনি বক্তব্যে এবং বক্তব্যের ভঙ্গিতে, এবং ছবিগাঁথার কারিগরিতে। গত ১১ মে তারিখে নন্দনে দেখলুম তাঁর আশ্চর্য শ্বাস-

রোধকারী ছবি "তিতাস একটি নদীর নাম"। ব্যাপ্তি আর গভীরতায় প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্কের গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে যে ঐক্য আর সংবেদন নিহিত আছে, আত্মিক ও ঐহিক আকুলতার প্রকাশে এবং সিনেমাটোগ্রাফিক আপন ঐশ্বর্যে বাঙলা ফিল্মজগতে এটি একটি অমূল্য মহাকাব্যগুণমণ্ডিত রত্ন হয়ে থাকবে। ইতিমধ্যে তপন সিংহ একের পর এক ছবিতে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে নতুনভাবে নানা বাঙালি চরিত্র ও সমাজকে প্রতিফলিত করেন নীরবে, ঢাকঢোল না পিটিয়ে, স্বীয় আত্মপ্রত্যয়ে একের পর এক যুগপৎ সুন্দর ও সমৃদ্ধ ছবি সৃষ্টি করে চললেন, যার অধিকাংশই ভবিষ্যতের দিকে মুখফেরানো, অতীতের দিকে নয়; নস্ট্যালজিয়া বা স্মৃতিমেদুরতার স্যাকারিন নেই।

সত্যজিৎ রায়ের তিনটি অপু ছবি নিশ্চয় বাঙালি সমাজের আর চৈতন্যের উচ্চতর স্তরের বিশুদ্ধ রূপ, যার প্রতি শত খেদ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, যামিনী রায়ের ছিল এত আসক্তি এবং একাগ্রতা অথচ নিরাসক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। সত্যজিৎ রায় পরের ছবিগুলিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় বা ডেকাডেন্স দেখিয়েছেন। এসেছে অতীতের সম্বন্ধে নস্ট্যালজিয়া, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে চিত্ত-শুদ্ধি বা ক্যাথার্সিস হয় না; যেমন 'জলসাঘর' বা 'শতরঞ্জ কী খেলাড়ি' অতীত সম্বন্ধে তাঁর বরাবর যেন একটা অহেতুক স্নিগ্ধতা রয়ে গেল। মৃণাল সেন বর্তমান বাঙালি সমাজের সমস্যা উপস্থাপিত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন, যদিও তাঁর কণ্ঠস্বর সময়ে-সময়ে এত উচ্চ হয় যে সন্দেহ হয় এর কিছুটা অনাবশ্যক নাটকীয় কিনা, বা বক্তব্যগুলি শখের উর্দি পরে নিজেদের একটু বেশি জাহির করছে কিনা। তবে তিনি আনলেন বিবাদ, বিসংবাদ, অসৌন্দর্য, উদ্বেগ, করলেন নস্ট্যালজিয়ায় আঘাত, দর্শককে তাঁর আপন বিতর্কে টানতে সমর্থ হলেন। সেই সঙ্গে তিনি বাঙালি সমাজ ও পরিবারের এতকাল অনেক কিছু বিনা তর্কে মেনে নেওয়ার সম্পর্কের উপর নতুন বিতর্কের আলো ফেললেন। তিনি বাঙলা ফিল্মকে রূঢ় বর্তমানে এনে ফেললেন। আরো পরে এলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ প্রমুখ নতুন শিল্পীরা, যাঁরা ভারতের বৃহত্তর সত্তার সন্ধানে বাঙালি মন নিয়োগ করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরনের সন্ধান কতদূর সার্থক হতে পারে? না, আমরা আবার আছুর গোপালকৃষ্ণণ, অরবিন্দন বা রতন থিয়মের মতো যে সমাজের মধ্যে শিল্পী জন্মেছেন আর বেড়ে উঠেছেন তার সন্ধানেই বেশি সার্থকতা লাভ করব!

ইতিমধ্যে আমাদের ঘাড়ে আরেকটি অবাঞ্ছিত ভূত চাপার অবস্থা হয়েছে। সেটি হচ্ছে বিদেশী ফিল্মোৎসবে স্বীকৃতি বা পুরস্কার পাবার উদগ্র বাসনা। কোন্ ধরনের ছবি বিদেশীরা বেশি পছন্দ করবে, সেইমতো রপ্তানি মাল ও মশলার জন্যে আমরা যেন কিছুটা কাঙাল হয়েছি। সম্প্রতি ফরাসি দল কর্তৃক কলকাতায় আনন্দময়ী নগরীর ছবি তোলা ব্যাপারে এক-আধজন প্রথ্যাতনামা শিল্পীর কৌতুকোদ্দীপক 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' ধরনের বক্তব্যেও এইজাতীয় ব্যাকুলতার আমেজ পাই। নিজের শহরের প্রেক্ষাগৃহে একের পর এক ছবি ওঠামাত্রই ধপ করে পড়ে যাচ্ছে, যার খেদে আমরা বলি আমাদের সমাজ আমাদের ছবি গ্রহণ করার জন্যে তৈরি নয়, ইওরোপই শুধু ঠিক বোঝে, যে ধরনের কথা জীবনে স্বদেশবাসীর কাছে শত লাঞ্ছনা পাওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন বলেন নি। আমরা ভুলে যাই ইওরোপ এখন তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে নিজেদের মতো না ভেবে অনুগত পোষ্য হিসাবে ব্যবহার করে তাদের মহিমা আর আধিপত্য বজায় রাখতে চায়, ঠিক যেমন, তাদের যখন সাম্রাজ্য ছিল, তখন রায়বাহাদুর, রায়সাহেব খেতাব বা কাইজার-ই-হিন্দ পদক দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধতেন। শ্বেতাঙ্গভক্ত দাসমনোপ্রবৃত্তির পক্ষে এ প্রলোভন ত্যাগ করা শক্ত। আন্তর্জাতিক ফিল্ম-প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আমার এই দ্বিধা গত বছর কুড়ি ধরে বেড়েছে। বিতৃষ্ণা বেড়েছে এ বছর ইরাক-যুদ্ধের

পরে। সেদেশের জনগণকে কীটপতঙ্গের মতো মারা আর ঘৃণার বহর দেখে।

চিত্রকলার ক্ষেত্রে

সবথেকে চমৎকারী সমৃদ্ধি এসেছে চিত্রকলায়, এনেছেন তাঁরা যাঁরা ১৯৪০-এর কিছু আগে-পরে বা তারও পরে জন্মেছেন। এই নতুন প্রজন্মরা এই নগরের মালিন্য, কদর্যতা, জঘন্যতা, অর্থহীনতা, বর্বরতা, নাগরিকের ক্লান্তি, বিহ্বলতার অন্তরে যে সৌন্দর্য ও রোষ লুকিয়ে আছে, তাই টেনে-টেনে বার করার প্রয়াসে খুঁজছেন এক নতুন নান্দনিক দর্শন। ঠিক যেমন ১৭৯৮ সালে তাঁর লিরিকাল ব্যালাড্‌সের ভূমিকায় কবি ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ হদিশ দিয়েছিলেন শিল্পবিপ্লব-যুগের উপযোগী এক নতুন কাব্যদর্শনের, যার কৃপায় মিলবে এই বিশৃঙ্খল জগতে এক নতুন শৃঙ্খলা, সার্থকতা ও সংহতি। সোমনাথ হোড়, পরিতোষ সেন বা প্রদোষ দাশগুপ্ত তাঁদের সময়ে এক নতুন চিত্রভাষার আলোচনা শুরু করেন এবং সার্থকতা লাভ করেন; তবে বর্তমানে শুভাপ্রসন্ন, বা তাঁর অগ্রজ বা অনুজ চিত্রকররা, যেমন বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার, যোগেন চৌধুরী, পাণেসর, রবিন মণ্ডল, বিজন চৌধুরী, শ্যামল দত্তরায়, ইশা মহম্মদ, সোমনাথ মাইতি—নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি নাম করলুম—তাঁরা তাঁদের বলিষ্ঠ ও উদ্দীপক তুলিতে এমন কিছু-কিছু ভাষ্য আর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যার উল্কাসে অতি সাধারণ, ক্লিন্ন, বীভৎস পরিবেশ বা বস্তুও ধ্যান-গম্ভীর সৌন্দর্যের সন্ধান দেয়। মনকে শুদ্ধ করে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ভারতকে দেবার মতো মানব-ঐশ্বর্য ও শিল্পদক্ষতা তাঁদের যথেষ্ট আছে, যার তুলনায় গত-কালের, এমনকী আজকেরও অন্যান্য রাজ্যের অনেক প্রথিতযশা শিল্পীর কাজ গৌণ বলে মনে হয়।

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে

গত চল্লিশ বছরে কেন্দ্রের সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির চেষ্টায় ভারতের প্রতি রাজ্যে, শুধু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য নয়, নানা জাতি, প্রজাতি, উপজাতি নৃত্যগীত, নাটক ও তজ্জাতীয় অন্যান্য সংস্কৃতির খুব হৃদয়গ্রাহী মনোরম ও মূল্যবান উন্মেষ হয়েছে। এই ধরনের লুপ্তপ্রায়, লৌকিক ও উপজাতিগত নাট্যধারা নাচ, অভিনয়, মূক ও মুখোস অভিনয়, লৌকিক, মার্গ ও ধর্মীয় সঙ্গীত, অনেককিছুই পুনরুজ্জীবিত হয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে, বিশেষত যেসব ঐতিহ্য অবহেলায় এবং ব্যাপকতর পরিচয়ের অভাবে মৃতাবস্থায় ছিল। পুনরুজ্জীবনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দাক্ষিণাত্যের যক্ষগান। অবহেলার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—বাঙলার পরম গৌরব কীর্তন। বিশুদ্ধ চর্চার অভাবে নবদ্বীপের গৌরবময় ঐতিহ্য এখন সত্যিই বিপন্ন। কলকাতা-বাসী যে দু-একজন গুণী কীর্তনিয়া এখনও সৌভাগ্য-বশে আমাদের মধ্যে আছেন তাঁরা চলে গেলে কী হবে ভাবলে দিশেহারা হতে হয়। এখন কীর্তনের বিশুদ্ধ আখর শুনতে হলে মায়াপুরের আমেরিকানদের গলায় শুনতে হবে। আজ আউল ও দরবেশ প্রায় লুপ্ত; বাউল নামে যা সাধারণত চলে তা নিতান্ত বিরক্তিকর ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়েছে। এখনও এক-আধজন মহান বাউল আছেন তাঁরা লজ্জায় সাধারণ সভায় বা দূরদর্শনে আসেন না। আজের গম্ভীরা বা শেখ গোমানি দরের কবিগান রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রায় লুপ্ত। অথচ ১৯৪৫-৪৬ সালে মহম্মদ আলী পার্কে কমিউনিস্ট পার্টিই এঁদের বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করেন। আদিবাসীদের বহুমুখী, বিচিত্র নাচের ঐতিহ্যরাজি সম্বন্ধে রাজ্যের অ্যাকাডেমির কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। গত ত্রিশ বছরে ওড়িশি নৃত্য পৃথিবীতে আপন মহিমায় স্থান পেয়েছে। তার পিছনে ছিল গত তিন দশক ধরে কতিপয় নিরলস রসজ্ঞ ব্যক্তির

তন্নিষ্ঠ গবেষণা, কল্পনা আর পরিশ্রম। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের ভিতরের দেয়ালগুলিকে সমুজ্জ্বল করে আছে যেসব নৃত্যের ধারাবাহিক ঠাট, তাতে আমার মতো অনভিজ্ঞ দর্শকেরও প্রতীতি হয় যে মাত্র দু-তিন শ বছর আগে বিষ্ণুপুরী নৃত্যরীতি বলে একান্ত স্থানীয় একটি ঘরানা নিশ্চয় ছিল। অথচ আজ এই নৃত্যরীতি পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে এ রাজ্যে কোনো গবেষণা, উৎসাহ বা নিষ্ঠা নজরে পড়ল না।

কুৎসিত সম্ভোগপ্রবণতা

বাঙালি সাধারণ যে অবস্থায় ঘরদোর রাখেন তাতে ধারণা হতে পারে তাঁদের পয়সা নেই। অথচ আপনি যদি যে-কোনো বিকেলে ডেকার্স লেনে যান দেখবেন, যাঁদের দেখে মনে হয় নিতান্তই নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানি, তাঁরা রোজ কী পরিমাণ পয়সা খরচ করে প্লেটের পর প্লেট দামি মুরগীর কোর্মা খাচ্ছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখেছি কত-কত কলেজের অধ্যাপক, এমনকী স্কুলের শিক্ষকরাও মাসে ষোলো আঠারো হাজার টাকা রোজগার করেন। যেভাবে উপায় করেন তাতে এক পয়সা আয়কর দিতে হয় না। তাঁর উক্তির কোনো প্রতিবাদ পড়ি নি। গত কয়েক বছর ধরে অফিস কর্মচারী ও শিক্ষকদের মধ্যে লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফ্ল্যাট কেনার হিড়িক দেখেই বোঝা যায়। বিশ বছর আগেও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো সেক্রেটারি, যিনি নাকি সরকারি মানে সবথেকে বেশি বেতন পেতেন, তিনি এসব বিলাসের কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। বাঙালি পরিবার নতুন বধূদের সাধভক্ষণে, সন্তানজন্মে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, জন্মদিনে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে এবং সামান্যতম কারণে, যে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খরচ করেন—বিবাহের সময়ে যৌতুকের কথা ছেড়েই দিন—তাতে আমাদের বয়সের লোকের শ্বাসরোধ হবার মতো হয়। অথচ নতুন বাড়ি করে তাঁরা হাজার দশেক টাকা খরচ করে দেয়ালের শোভা বর্ধনের জন্যে দু-একটি ছবিও কিনবেন না। অবাঙালি নাগরিকরা তাঁদের নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের সুচারু সভাগার নির্মাণ করেছেন, কিন্তু কোনো বাঙালি সে উদ্দেশ্যে নামমাত্র চাঁদা দিতেও নারাজ। একমাত্র উল্লেখযোগ্য খরচ হয় আজকাল রঙিন টি-ভি, ভিডিও, ভি-সি-আর কিনতে, যেগুলির বিষময় ফল আজ অনেক বাড়িতেই দেখা যাচ্ছে। কলকাতার প্রেক্ষাগৃহ, সভাগৃহ, নাট্যমন্দির, প্রদর্শনীক্ষেত্র মূলত এখন অবাঙালি মালিকানায় আর অধিকারে। কোনো কিছু ভালো দেখতে গেলে, শুনতে গেলে, আলোচনা করতে গেলে তাঁদের দ্বারস্থ হতে হয়। এক হিসাবে ভালোই, কারণ এখনও যেগুলি বাঙালি প্রতিষ্ঠান টিমটিম করছে, সেগুলিও বিবাদবিসংবাদে পর্যুদস্ত। কলকাতার সংস্কৃতির জগৎ এখন আর বাঙালির আয়ত্তে নেই। কলকাতার শিল্পী-দের প্রায় সবকিছু উল্লেখযোগ্য কাজ এখন অবাঙালি বাসিন্দাদের ঘরে। আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রায় সবকিছু নিদর্শনের সেই অবস্থা। চল্লিশ বছর আগেও যে দায়িত্ব বহন করতেন দাস-লাহা-মল্লিক পরিবাররা। এক হিসাবে ভালোই হয়েছে, কারণ আমাদের অবাঙালি নগরবাসীরা এইসব অমূল্য সম্পত্তি যে যত্নে রাখেন, তা একমাত্র ছিল শ্রীমুকুল দে মহাশয়ের। অথচ দুঃখের বিষয়, এতই আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ যে—রাজস্থানী, গুজরাতী সমাজ এখন কলকাতার সংস্কৃতি চালু রেখেছেন, তাঁদের সঙ্গে বাঙালি সমাজের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পারিবারিক আদানপ্রদান, কুটুম্বিতা বা আত্মীয়তা গড়ে উঠল না। এ বিষয়ে আক্ষেপ বাড়াব না। উপরন্তু, আমরা এত কূপমণ্ডুক হয়ে গেছি যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেসব উন্নতি হচ্ছে সে সম্বন্ধে সামান্য—অকুণ্ঠিত তো নয়—স্বীকৃতি দিতে নারাজ। আমরা হয় উদাসিক না হয় অজ্ঞ। বাঙালির এরকম হীনম্মন্যতা ছিল না। সুখের কথা প্রবাসী বাঙালিরা তবু কিছু অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ ও কুটুম্বিতায় আবদ্ধ হচ্ছেন।

চিকিৎসার জগৎ

ষাটের দশকের প্রথম পর্যন্ত কলকাতা শহরে চিকিৎসা-ব্যবস্থার বিশেষ সুনাম ছিল। ডাক্তার আর শল্য-চিকিৎসকরা ছিলেন অগ্রগণ্য। সারা ভারতে বাঙলার বাইরে যখন ডাক্তার হিসাবে শুধু জীবরাজ মেহতার নামই শোনা যেত, তখন কলকাতায় তাঁর সমতুল্য অন্তত দশজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। হাসপাতালের মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেনারাল ও মেডিক্যাল কলেজের তুলনা কমই ছিল। এখন কোনোকিছু জটিল চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের জন্যে বাঙালিকে ছুটতে হয় বম্বে, দিল্লী, ভেলোর বা মাদ্রাজে। কলকাতার খুব কম বাঙালি ডাক্তারের কক্ষে রোগী দেখার উত্তম ব্যবস্থা আছে। তুলনায় ভারতের অন্যত্র মাঝারি শহরেও যে সরনজাম দেখা যায় তাতে আশ্চর্য হতে হয়। সাজানো, সরনজামপূর্ণ রোগী-পরীক্ষার ব্যবস্থায় বিশ্বাস আর ভক্তি আসে। সরকারি হাসপাতালগুলি তো এখানে নরককুণ্ড; অনেক পাপ না করলে সেখানে চিকিৎসার জন্যে কেউ যাবে না। অথচ এই কলকাতাতেই—রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান বলে যদি বাদ দিই বাঙালির একান্ত নিষ্ঠা, উদ্যম ও আত্মনিবেদনের ফলে সর্বোচ্চমানের দুটি সেবা প্রতিষ্ঠান সকলের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে: একটি ডা. সরোজ গুপ্তের নেতৃত্বে ক্যান্সার কেন্দ্র ও আরোগ্য নিকেতন, অন্যটি শ্রীসাধন দত্তের নেতৃত্বে শ্রীঅরবিন্দ সেবাকেন্দ্র। এ দেশে মানুষের রক্ত কত সস্তা এবং অনায়াসে অপচয় করা যায় তা শুধু বক্রেশ্বর নয়, অধিকাংশ ব্লাড ব্যাঙ্ক দেখলেই বোঝা যায়। বাঙালি এনজিনিয়াররা আগে ভারতে সর্বত্র শীর্ষস্থানে কাজ করতেন, এখন কমে আসছে। গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে, সুপ্রীম কোর্টে, যে-কোনো প্রসিদ্ধ নগরের বার লাইব্রেরিতে বাঙালি আইনজীবীরা আসন অলঙ্কৃত করতেন। ইদানীং সে স্থানও গতপ্রায়। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক বিধানসভায় ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, আবুল কাশেম, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক, ভূপেশ গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা যে সুনাম রেখে গেছেন, তার তুলনায় এখনকার বাঙালি সাংসদরা অধিকাংশ সময়ে কী মানে নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন তা কাগজেই দেখি।

খেদ প্রকাশে এই ইঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ্য নয় যে বাঙালি জাতি হিসাবে ভারতের অন্য জাতি-প্রজাতি থেকে উন্নত ছিল, এখন নেই। কোনো জাতিই অন্য কোনো জাতির থেকে জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। শিক্ষাদীক্ষা, পেশা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ইতিহাসের কতগুলি দৈব সুযোগবশে বাঙলাই প্রথম উন্নতির পথে, সংস্কারের পথে, অগ্রসর হয়। আশা করাই অন্যায়, শুধু এই কারণে অন্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলা চির-কাল ধরাছোঁয়ার বাইরে এগিয়ে থাকবে। অন্য রাজ্যের লোকেরা নিশ্চয় এই দূরত্ব পরিক্রম করে সমান-সমান যাবেন, এই আশা করা উচিত, সেই হল প্রগতি এবং কালের নিয়ম। কিন্তু যে-রাজ্য আগে অত অগ্রসর ছিল—জ্ঞানে, নিষ্ঠায়, উদ্যমে, উদ্ভাবনাশক্তিতে—সে এত দ্রুত পিছিয়ে যাবে, তার মধ্যে এত ক্ষয় আর হীনম্মন্যতা দেখা দেবে, বাঙালি হিসাবে আমার সে-সত্য মেনে নিতে বাধে, বিশেষত যৌবনে যখন আমি বিপরীত অবস্থায় বড়ো হয়েছি। ইতিহাসে দেখা গেছে—আর্থিক, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যবসা, প্রযুক্তি, পেশা, উদ্যম, নিষ্ঠা, শিক্ষা, অধ্যবসায়, আগ্রহে ও সাথে-সাথে দেশের জাগতিক ধনোৎপাদনে যদি অবহেলা আসে, তবে তার প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী, তার সঙ্গে মানব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাফল্যের মান ক্রমশ পড়বে।

আমাদের নতুন প্রজন্ম

মানুষ বাঁচে গতকালকে ফিরে পাবার আশায় নয়, আগামী কালের ভোরের আলো ফোটার আগে তাকে স্বাগত জানাতে। বরাতে যদি থাকে নতুন দিনের স্বাদ পাবেন অন্ধকার থাকতেই, পুব আকাশে একটি তারা তখনও জ্বলজ্বল করছে। এই তারাই আপনাকে আচমকা স্বাগত জানাবে পুতিগন্ধময় গলিতে। অপুষ্টি আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সত্ত্বেও, আমাদের শৈশবকালের থেকে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের ওজন আর দৈর্ঘ্য একটু বেড়েছে মনে হয়। অতীতে যেখানে এক-আধ জন বিদ্যাসাগরকে রাস্তার আলোর তলায় পড়তে দেখা যেত, আজ দুর্গন্ধময় নালার পাড়ে অনেক অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েকে দেখবেন বায়োলজির সেট নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তাদের সকলের মধ্যে দেখবেন আশেপাশে, এমনকী সুদূর বিদেশে কোথায় কী হচ্ছে সবকিছুতে উৎসাহ, সে গীনেস রেকর্ড হোক বা মহাশূন্যে সুদূর নীহারিকামণ্ডলই হোক। দূরদর্শনে চিচিং ফাঁক, ছোটোদের আলোচনা-অভিনয়ে, তরুণদের জন্যে প্রোগ্রাম অথবা সংবাদপত্রে ছোটো-দের পাতায় দেখবেন তাদের তাদের সর্বত্রগামী উৎসাহ, ঔৎসুক্য, বোধ, জানার আগ্রহ। আমাদের শৈশবের তুলনায় কত বেশি, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। মনে রাখবেন, এ সবই সম্ভব হয়েছে এমন অবস্থায় যে আমি, আপনি হলে মাথা খারাপ হবার উপক্রম হত। একুশ শতকের প্রাক্কালে এই প্রজন্মের উপরেই আমি বিশ্বাস রাখতে চাই, প্রার্থনা করি তা যেন বজায় থাকে।

কলকাতাবাসী যদি একটু মানুষের মতো ব্যবহার বা বাঁচার সুযোগ পায়, তাহলেই সে যেন বর্তে যায়। মেট্রোরেলের কথাই ধরা যাক। ষাটের দশক থেকে কলকাতায় যা কিছু আন্তর্জাতিক সাহায্য এসেছে তার মধ্যে মেট্রোরেলই নিঃসন্দেহে সবথেকে শুভবুদ্ধি, সৌকর্য, মমতাবোধ ও স্থায়িত্বের প্রতীক হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত, এই মেট্রোরেলই ভারতের অন্য নগরগুলির তুলনায় নতুন এক অগ্রগণ্যতা দিয়েছে। কলকাতাবাসীও তাকে বহুমূল্য উপহার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কলকাতায় যিনিই আসেন, প্রতি-বারই তিনি শহরের নোংরা বিশৃঙ্খল অবস্থা, তার সঙ্গে কলকাতাবাসীর তার নগর-সম্বন্ধে একান্ত অবহেলা ও ঔদাসীন্য দেখে, আত্মসম্মানের অভাব দেখে, বীতশ্রদ্ধ হন। অন্যদিকে আবার মেট্রোরেলকে কলকাতাবাসী কেমন চোখের মণির মতো যত্ন আর রক্ষা করে দেখে তিনি অবাক হবেন।

কেন এরকম হয়? প্রথমত মেট্রো কর্তৃপক্ষ জন-সাধারণের যাবতীয় প্রয়োজন আর সুবিধার প্রতি লক্ষ রাখেন। প্রতিরাত্রে পরের দিনের জন্যে প্রত্যেকটি গাড়ি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার ঝকঝকে করা হয়। দ্বিতীয়ত, যাত্রীদের সুখসুবিধা কী করে বাড়ানো যায় এবং সেগুলি যাত্রীরা তারিফ করতে পারেন, সে বিষয় কর্তৃপক্ষ সতত যত্ন নেন। কলকাতাবাসীও এই প্রয়াসে আনন্দ প্রকাশ করেন, বোঝেন কর্তৃপক্ষ তাদের মানুষের সম্মান দেন। এই ধরনের মনোযোগ আর যত্নের ছিটেফোঁটাও তাঁরা সরকার বা পুরসংস্থার থেকে পাবার কল্পনাও করতে পারেন না। মিনিবাসে, বেসরকারি বা সরকারি বাসে ট্রামে তাঁরা যেরকম মালগাড়িতে পোরা গোরুছাগলের মতো হেনস্থা পান, অপমানিত হন, তার তুলনায় মেট্রোতে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত আরামে তারা যে তৃপ্তি আত্মশ্লাঘা বোধ করেন তাতে মেট্রোর প্রতি তাঁদের মমতা আর যত্ন বাড়ে।

কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত পল্লী আর বস্তিগুলিকে কী ধরনের অপমান আর অবহেলা চোখে আঙুল দিয়ে করা হয় তার এক-আধটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। বহু লক্ষ, সম্ভবত কোটি-কোটি টাকা খরচ করে প্রতিরাতে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালকে আলোয় ঝলমল রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, পুরকর্তা ও সরকারের অহমিকা ও আত্মপ্রসাদবৃদ্ধির জন্য। অথচ রাতের পর রাত বিজলির অভাবে লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়ের পড়া-শোনা নষ্ট হয়। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের রাতকে দিন করার আলোয় যদি অন্তত ছেলেমেয়েদের

লেখাপড়া, আমোদ আহ্লাদ, নাটক অভিনয়, খেলাধূলার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলেও এই আলোর কিছু সদ্ব্যবহার হত, শহরের নিছক বাহার বৃদ্ধি ছাড়া। মগজ খাটালে এসব ব্যবস্থা অনায়াসেই সম্ভব হতে পারে। শূন্য ময়দানে আলোয় ঝলমল অজস্র ফোয়ারার বদলে সেই বিজলি আর টাকা যদি বস্তিতে-বস্তিতে যেখানেই একটু ফাঁকা জমি আছে সেখানে এক একটি সোডিয়াম মাস্ট লাইট বসানো যেত তাহলে পাড়ার ছেলেরা শুকনো দিনের সন্ধ্যাবেলায় পড়াশোনা, নাচগান, খেলাধূলা করতে পারত, পাড়ার মেয়েরাও শিল্পকাজ পড়াশোনা করতে পারতেন। কিছু টাকা খরচ করে কর্পোরেশনের স্কুলগুলিতে প্রতি ক্লাসের জন্যে কয়েকটি ফুলের টবে সেই ক্লাসের ছেলেমেয়েকে দিয়ে ফুলের চারা বাঁচিয়ে রেখে যদি ফুলফোটানোর প্রতিযোগিতার সব ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে কলকাতাবাসী ছেলেমেয়ের সৌন্দর্যবোধ আর প্রকৃতির প্রতি মমতা বাড়ত।

ভারতের যত নিঃস্ব, বেকার, পদতলে দলিত লোককে কলকাতা অতি যত্নে বরাবর বুকে তুলে নিয়েছে। এককালে কলকাতা হয়তো প্রাসাদেভরা রাজধানী ছিল, কিন্তু চিরকালই সে ভারতের দরিদ্রতম অঞ্চল থেকে অনাথদের আহ্বান করেছে, দিয়েছে তাদের জীবিকা, যার বলে, রাস্তায় জীবনযাপন করলেও, তারা পেত আত্মসম্মান, আত্মার স্ফূর্তি। সে জীবিকাবলে সে আপন ভরণপোষণের সঙ্গে অনেক কষ্ট সহ্য করে, সঞ্চিত অর্থ দেশে পাঠাত। সেই অর্থের বলে আজ ভারতের যেসব অঞ্চল একদা একান্ত নিঃস্ব ছিল—যেমন উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ, উত্তর ও দক্ষিণ-বিহার, উড়িষ্যা, তেলেঙ্গানা, ছত্রিশগড়—তাদের চেহারা ফিরে গেছে।

অন্য প্রদেশ থেকে আসা আগন্তুকদের অল্প মজুরির হাড়ভাঙা মেহনতের ফলেই, শুধু কলকাতা নয়, সারা পূর্বভারতের যতকিছু শিল্প, দৌলত, জ্ঞান, দক্ষতা এবং নাগরিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। আগন্তুকরা সেই সঙ্গে পেয়েছে তাদের গ্রামের জাতপাত প্রভৃতি সামাজিক বাধানিষেধের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি, নতুন-নতুন পেশা আর কৌশল অর্জনের সুযোগ, বুক ভরে শহরের স্বাধীন হাওয়া টানার আরাম, গ্রামের অন্ধকারের বদলে শহরের রাতকে-দিন-করা আলোর বাহার, যা কিছু জীর্ণ, পুরনো, বস্তাপচা তাকে নিজের বুদ্ধিতে বিচার করে গ্রহণ বা ত্যাগ করার শক্তি। পেয়েছে নতুন প্রাণশক্তি, উৎসাহ আর সংবেদনা। যত কিছু নোংরা, মলিন, অস্বাস্থ্যকর তার বিরুদ্ধে জান্তব শক্তি দিয়ে মরিয়া হয়ে বাঁচার যুদ্ধে নিরন্তর রত। আবার তার মধ্যেই তার যত কিছু আনন্দ, হাসি-ঠাট্টা, ভালোবাসা, আত্মোৎসর্গ। যার কল্যাণে—নিষ্ঠুর ঠাট্টার মতো শোনালেও—কলকাতা এখনও আনন্দময়, প্রাণোচ্ছল শহর। অমানুষিক জীবনযাত্রা সত্ত্বেও দেখি বিশেষ এক মাধুর্যময় মানবিক সম্পদ, যার ফলে নিদারুণ রুক্ষ পরিবেশেও এক ধরনের নম্রতা আর কোমলতা আসে।

ভারতের অন্যান্য নগরগুলি যেন বিক্ষুব্ধ সাগরে ছোটো বড়ো দ্বীপের মতো জেগে আছে মনে হয়। তাদের তুলনায় কলকাতা এখনও দেশের সঙ্গে, গ্রাম-শহরের অদ্ভুত এক সমন্বয় সাধন করে একাত্মতায় বদ্ধ। এই একাত্মতার যা কিছু অবাঞ্ছিত সেগুলি কাটিয়ে তাকে আবার এক মহানগরীর ন্যায্য মহিমায় ফিরে যেতে হবে।

অশোক মিত্রের জন্ম ১৯১৭ সালে। পড়াশুনা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং অক্সফোর্ডে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান ১৯৩৯ সালে। এই পরিষেবায় তিনি একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি। শিক্ষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত। অধ্যাপনা করেছেন জওহরলাল ইউনিভার্সিটি এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। ইংরাজি এবং বাঙলা উভয় ভাষাতেই অশোক মিত্রের লিপিকুশলতা সর্বজনবিদিত। তাঁর কৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। জনসংখ্যাতত্ত্ব, শিল্পকলার ইতিহাস, বাঙলা সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রী মিত্রের গভীর অনুশীলন জাত লেখাগুলি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার এবং বোধের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে।

গোলাপগুচ্ছ

সুরজিৎ ঘোষ

বিষণ্ণ ট্রাফিক সিগনালে দুদিকে রয়েছে থেমে গাড়ি
আর ভিতরের অন্ধকারে অদ্ভুত গলায় সেই মেয়েটি বলেছে
'তুমি তো আগন্তুক, অপরিচিতের মতো
তোমাকে কী বিশ্বাস আমার?'
আসলে প্রশ্ন নয়, সেকথা সে নিজেকে বলছিল।
যেন উচ্চারণে ভাবা, নিস্তব্ধ বাতাসে
পাক খেতে-খেতে নেমে যাওয়া।
ছেলেটি উত্তর দেয় নি, অভিমানে নাকি অপমানে?
শুধু ভেজা-ভেজা হাতে গুছিয়ে দিয়েছে কিছু ঝুরো চুল
মেয়েটির ছোট্ট কপালে
খোলা জানালার ধারে ততক্ষণে জড়ো হয়ে গেছে
ভিখিরি বাচ্চার হাতে, হতে পারে কবরখানার,
লাল গোলাপের তোড়া, মাঝে-মাঝে দু-একটা
চোখে পড়বার মতো শাদা

আততায়ী

অরূপকুমার মুখোপাধ্যায়

অনেক গড়েছি আমি ইট কাঠ সুসজ্জিত বাঁধানো চত্বর
মূলের উপরে কাণ্ড বড়ো বেশি বিষফল ঘুণধরা কাণ্ডের উপর
নিজেকেই বেঁধেছি আমি শতপাকে নিজেরই কাঠামোয়
এবার ফিরে যাব বন্ধু হে হাতে নেই অনন্ত সময়
থেকেই কি লাভ হবে ফিরে যাওয়া মানেই কি বোকামি
অসহ্য এ অভিনয় মিথ্যা মঞ্চে নিছক প্রবঞ্চনা ও ভণ্ডামি
মায়ারজ্জু পড়ে আছে ভয়ঙ্কর সাপ ভেবে লাভ কী
চোখে চোখ রেখে এই বেঁচে থাকা মোহগ্রস্ত শুধুমাত্র ফাঁকি
আনন্দ আর হাসিগান কোন্ দিন ভুলে গেছি নেই আর কিছু
আমারই আততায়ী আমি পথ ফিরি শুধু আমারই পিছু-পিছু

অবচেতনায়

নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

রূপ রস আকাঙ্ক্ষা
তোমার টানটান উপস্থিতির মধ্যেই।
ইচ্ছাপূরণের বিকল্প আবেগ
পুরোপুরি তোমার দৃষ্টির উপর
নির্ভরশীল।
কাহিনীবিন্যাসের মতো শরীরের অমরতায়
সাহায্যকারী চাঁদের প্রয়োজন হয় না
তবে।
ইচ্ছাপূরণের খেলায় তোমার হাত
ইন্দ্রজালের মতো সুন্দর।
অমরাবতীর অপরূপতার জন্যে
এক মহামন্ত্রধ্বনি।
উত্তরপুরুষের সম্ভাব্য আনন্দে উচ্চারণ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সে উচ্চারণ—
নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, ফুল থেকে ফুলে,
জল থেকে জলে।
অনন্ত সুখের মতো চৈতন্যে।
অবচেতনায় চৈতন্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা,
উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা।
তোমার সুস্থির উপস্থিতি
তারই উলঙ্গ-উল্লাস।

ধবধবে জ্যোৎস্নায়

শীতল চৌধুরী

পূর্ণিমার ধবধবে জ্যোৎস্নায়
মাথার ভেতরে
চোখের ওপরে
আমার স্বপ্নেরা কথা বলে ;

স্বপ্নেরা আমার স্মৃতিকে
হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে নিয়ে যায়
ঝাউবন-নদীর কিনার দিয়ে
পলাশ আর মহুয়ার জঙ্গলের দিকে

তারপর স্বপ্নেরা নানান ছোটোবড়ো বৃত্ত রচনা করে
আমার স্মৃতি ও সত্তাকে জাদুমন্ত্রে
মুহূর্তের মধ্যে নতুন পোশাকে বদলিয়ে
ঠাণ্ডা কফিন ভেঙে প্রাণ দেয়
এক মৃত বসন্তপাখিকে ;
প্রাণ পেয়ে সেই পাখি
শিশ দিয়ে নেচে-নেচে গান গায়—
তার গানে চিতার পোড়াকাঠ থেকে
জেগে উঠে চলে আসে আমার নিকটে
একে-একে অসংখ্য স্বর্গের আলোর পরীরা

নাচে গানে তারাও মেতে ওঠে
চারপাশের বাতাসকে আলোড়িত করে ;
পরীদের নাচের ছন্দে-ছন্দে
মাথার ভেতরে
চোখের ওপরে
আমার স্বপ্নেরা আরও মাদকতা পায়

আমার হৃৎপিণ্ডের ওপরে দেখি অকস্মাৎই তারপর
আমার অজান্তেই স্থাপন হয়
আর-এক হৃৎপিণ্ড
মাথার ভেতরে এক মাথা
চোখের ওপরে দুই চোখ।

বেসরকারি শিক্ষার পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

দীনেশচন্দ্র সিংহ

প্রায় নয় বৎসর বয়সে বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ঠাকুরদাসের হাত ধরে কলকাতায় এলেন। ১৮২৯ সালের ১ জুন গভর্নমেনট সংস্কৃত কলেজে ভরতি হলেন এবং একাগ্রচিত্তে বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নান্তে কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের প্রশংসাপত্র লাভ করে তাঁর সফল ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি। আর, মাত্র ২৫ দিন পর, অর্থাৎ ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেমবর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতরূপে তাঁর চাকরি-জীবন শুরু করলেন।

বিদ্যাসাগরের চাকরি-জীবনের পরিধি ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেমবর থেকে ১৮৫৮ সালের ৩ নবেমবর পর্যন্ত। এর মধ্যেও ১৬ জুলাই ১৮৪৭ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত বিরতি। ফলে, বিদ্যাসাগরের চাকরি-কালের মেয়াদ সাকুল্যে কিছু-বেশি ১৫ বৎসর। এই অত্যল্প কালের মধ্যে তিনি শিক্ষাজগতের বিভিন্ন দিক এবং পর্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তথা পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টানট সেক্রেটারি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক, পরে অস্থায়ী সেক্রেটারি, এবং অবশেষে সেক্রেটারি পদ তুলে দেওয়া হলে প্রথম প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ এবং সর্বশেষে অধ্যক্ষপদের সঙ্গে দক্ষিণ বাঙলার স্কুল ইনস্পেক্টরের দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

কিন্তু এই অত্যল্প চাকরি-জীবনের মাঝেই বিদ্যাসাগর বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। সেগুলির এক কালানুক্রমিক তালিকা থেকেই বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার বিভিন্ন এবং বিচিত্রমুখী প্রতিভা এবং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাবে—

১৮৫০, জানুয়ারি —বীটন নারী বিদ্যালয়ের

ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ শিক্ষাজীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক এবং গ্রিফিথ স্মারক পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কলার ; বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্টানট রেজিস্টার।

	অবৈতনিক সম্পাদক	
১৮৫৩	—বীরসিংহের অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন	
১৮৫৫, জুলাই	—নর্মাল স্কুল স্থাপন মডেল স্কুল স্থাপন	
অগস্ট-সেপটেম্বর	—নদীয়ায়	পাঁচটি
অগস্ট-অকটোবর	—বর্ধমানে	,,
অগস্ট-সেপটেম্বর-অকটোবর	—হুগলীতে	,,
অকটোবর-ডিসেম্বর	—মেদিনীপুরে	,,
১৮৫৬, জানুয়ারি	—মেদিনীপুরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন	একটি
১৮৫৭, নবেমবর-ডিসেমবর	—হুগলীতে	৭টি
	বর্ধমানে	১টি
১৮৫৮, জানুয়ারি-মে	—হুগলীতে	১৩টি
	বর্ধমানে	১০টি
	মেদিনীপুরে	৩টি
	নদীয়ায়	১টি

সুতরাং, ১৮৫৭ সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন বিদ্যাসাগর এদেশের বহুমুখী প্রতিভাধারী একতম শিক্ষাবিদ। এবং শুধুমাত্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে পদাধিকারবলেই নয়, শিক্ষা-জগতে নিজ অধিকারবলেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—সেনেটর হিসেবে মনোনীত হলেন। কিন্তু এই পদে তাঁর অবস্থান খুবই স্বল্পকালীন —এক বৎসর দশ মাস মাত্র। ১৮৫৮ সালের ৩ নবেমবর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন। শোনা যায়, উপরোক্ত বালিকা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের মাহিনা দেয়ার দায়-দায়িত্ব নিয়ে কর্তৃপক্ষের কথার খেলাপই বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের একটি কারণ। শিক্ষাবিস্তারে সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগেরও এখানেই ইতি।

একথা সবারই জানা যে, শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যুৎসাহী ব্যক্তি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার সম্ভাবনার আভাস পেলেই তিনি নেচে উঠতেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণাকে ইচ্ছামতো কার্যে রূপদানের এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ তাঁর হাতে এল অনতিবিলম্বে। শুরু হল বিদ্যাসাগরের জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল। উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে স্কুলটি ধুঁকছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ করেছেন শুনে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্কুলটির হাল ধরতে অনুরোধ করেন। তিনিও রাজি হন, এবং ১৮৬১ সালে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নেন। প্রাথমিক গোলযোগ মিটে যাবার পর তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় অল্প-দিনের মধ্যেই স্কুলের সার্বিক উন্নতি ঘটে। ১৮৬৪ সালে স্কুলের নাম পালটে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন রাখা হয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই ইনস্টিটিউশনে এফ. এ. এবং বি. এ. পড়াবার অনুমতি চাওয়া হয়। রেজিস্ট্রার এইচ. এস. স্মিথের কাছে বিদ্যাসাগর সমেত ইনস্টিটিউশনের ম্যানেজারগণ ১২. ৪. ১৮৬৪ তারিখে এক পত্রে লেখেন :—

With regard to the provision proposed to be made for the instruction of the students upto the standard of the B.A. degree, we beg to state that we have decided to organise the instructive staff as indicated in the statement. At present arrangement have been made for the instruction of the students in the course prescribed for the First Examination In Arts and 39 students have already been admitted to the class which has been opened from the commencement of the current session. Three teachers have been entertained for this special purpose and additions will be made to the instructive staff as the new department will be developed.

এই আবেদনপত্র পাবার পরেই সিনডিকেটে বিদ্যাসাগর-বিরোধী এবং শিক্ষাসংকোচন নীতির

সমর্থক সদস্যগণ নানা টালবাহানা করে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখে, এবং সে ফাঁকে এক্তিয়ার-বহির্ভূতভাবে অনুমোদন সম্পর্কীয় নিয়মবিধির পরিবর্তন সাধন করে বে-সরকারি প্রচেষ্টায় উচ্চশিক্ষাদানের পথে কাঁটা দেবার ব্যবস্থা করে। ফলে উক্ত আবেদনপত্রের পরিণতি সম্পর্কে সিনডিকেটের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় :—

'Read an application accompanied by necessary certificates for affiliation of the Hindu Metropolitan Institution.

Resolved—That the Managers of the Hindu Metropolitan Institution be informed that the Syndicate do not deem it advisable to affiliate their Institution.

(Minutes. dt. 3. 5. 1864)'

সিনডিকেটের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ হলেন, কিছুটা বিপন্ন বোধ করলেন। ছাত্র ভরতি করা হয়েছে, শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে; সে অবস্থায় কলেজ অনুমোদন না পাওয়ায় বিদ্যাসাগর অপ্রস্তুত হলেন। সিনডিকেটের সরকারি আর মিশনারি সদস্যরা বিদ্যাসাগরকে জনসমক্ষে হাস্যাস্পদ করে হয়-তো আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর সিনডিকেটের অন্যায় সিদ্ধান্ত নীরবে মেনে নিলেন না। তিনি প্রতিবাদপত্র পাঠালেন। সিনডিকেটে সে প্রতিবাদপত্র আলোচিত হল :—

'Read a memorandum by Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar protesting against a decision of the Syndicate by which they had declined to affiliate the Metropolitan Institution.'

এবং আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল—

'That Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar be informed that the Syndicate see no cause for altering their former decision.'

কিন্তু এ যেন বাঘের গায়ে খাগের খোঁচা। বিদ্যাসাগর কিছু কাল চুপচাপ রইলেন। এদিকে মেট্রোপলিটন স্কুলও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকে। বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালে আবার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে এফ. এ পড়াবার কলেজরূপে স্বীকৃতি দানের আবেদন জানালেন। শুনে অনেকেই ভ্রূ কুঞ্চন করলেন। দেশী লোকে আবার কলেজ চালাবে কী! বাঙালি কি ইংরেজি পড়াতে পারবে? তখন সারা দেশে গুটিকয় সরকারি আর মিশনারি কলেজ ছাড়া কোনো বে-সরকারি কলেজ ছিল না। এনট্রান্স পাশ-করা ছাত্রদের এফ.এ. আর বি.এ. পড়ার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। যা হোক, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের পরিচালকমণ্ডলী এফ. এ. পড়াবার অনুমোদন চেয়ে রেজিস্ট্রারকে পত্র লিখলেন :

To

J. Sutcliffe, Esq., M.A.

Registrar of the Calcutta University.

Sir,

We, the Managers of the Metropolitan Institution request that you will be so good as to lay before the Syndicate this our application for its affiliation to the Calcutta University upto the First Arts Examination.

As regards rules for affiliation we hereby declare that the Institution has the means of educating upto the First Arts Standard.

We annexe a statement showing the provision contemplated to be made for the instruction of the students upto the same standard after the sanction for affiliation is accorded. We beg leave to state that we will employ senior scholars of the Pre-University era or graduates of Calcutta University as Professors of the Institution. We hereby assure the Syndicate that the Institution, if affiliated, will be maintained on the proposed

footing for five years, and trust that this assurance will be deemed satisfactory.

We have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servants,
Iswar Chandra Sharma
Dwarka Nath Mitter
Krishto Das Pal
(Managers of the Metropolitan Institution).

Calcutta Metropolitan Institution,
The 25th January, 1872.

নিয়মমাফিক চিঠি লিখে বিদ্যাসাগর নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি স্বয়ং ভাইস-চ্যানসেলার মিঃ ঈ. সি. বেইলিকে এক ব্যক্তিগত চিঠি লিখলেন। সুদীর্ঘ এই পত্রখানির ছত্রে-ছত্রে ফুটে উঠেছে বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্য—যুক্তিনিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয়, তথ্যানুগত্য, বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সুদক্ষ শিক্ষা-পরিচালকের শিক্ষাপরিকল্পনার সুস্পষ্ট ছাপ :

My Dear Sir,

I beg to inform you that we have this day sent in our application for the affiliation of our Institution to the University for submission to the Syndicate at their meeting of this afternoon. I need hardly repeat that I would not have moved in this matter, did I not feel persuaded that we would have your kind support. Last year I took no action because I could not manage to see you. I do not know how the other members of the Syndicate would feel disposed, but I may mention for your information that one of the managers of the Institution saw Mr. Sutcliffe and also Mr. Atkinson, and the latter told him that although he had objections to the course proposed, still he had made up his mind not to oppose the application. If it should be asked at the Syndicate that the character of the instruction to be imparted in the Institution would be inferior inasmuchas as the instructive staff would consist exclusively of natives, I would take the liberty to remind you that the Sanskrit College, which teaches upto the B.A. standard, has an exclusively native staff, and that our Professors would be drawn from the same class of men. We feel confident, that native Professors, if selected with care and judgement would be found quite competent. But should we from experience feel the necessity of entertaining an English Professor for instruction in the English language, in which alone English aid might be necessary, we would certainly employ one—our object, it is needless for me to mention, is the good of the Institution and we will spare no means to accomplish it. I believe there is a desire in certain quarters to know the scale of pay we will allow to our Professors. This is a matter, I submit, between the employer and the employee and the affiliation rules, so far as I can understand them, do not require such details. It will be our aim to combine efficiency with economy and as I have spent, I may say, my whole life in managing schools, I hope you will allow me to exercise my own discretion in selecting Professors and regulating their pay.

I cannot too earnestly impress upon your mind that we strongly feel the necessity of converting our Institution into a High School. The high rate of schooling charged at the Presidency College is prohibitionary to many middle class youths, while their parents being opposed to their boys being sent to Missionary Colleges, they are obliged to give up academic education after matriculation. This Institution would be a great boon to them.

The managers of the Institution are myself, Justice Dwarka Nath Mitter and Babu Krishto Das Pal. We are satisfied that the means at our command will be quite sufficient for all the purposes of the Institution. But should any deficiency arise, we will be prepared to supply it from our pockets. I trust our assurance for the maintenance of the Institution on the proposed footing for five years will be deemed satisfactory by the Syndicate.

Trusting to be excused for the trouble,
I remain, my dear sir,
Yours sincerely
27th January, 1872. Iswar Chandra Sharma.

এবারে আর বিশ্ববিদ্যালয় সিনডিকেট আবেদন সরাসরি নাকচ করতে পারলেন না—বিদ্যাসাগর এফ. এ. পর্যন্ত অনুমোদন আদায় করে ছাড়লেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে উচ্চশিক্ষাপ্রসারে অংশীদার হতে পারেন নি বলে তাঁর যে আশাভঙ্গ হয়েছিল, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন মারফত তাঁর স্বপ্ন সফল করার সুযোগ পেলেন। ১৮৭৪ সালে ফার্স্ট আর্টসের পরীক্ষাতে ইনস্টিটিউশনের প্রথম আবির্ভাবেই অদ্ভুত সাফল্য। সাফল্যের তালিকাতে প্রেসিডেন্সির পরেই মেট্রোপলিটন দ্বিতীয় স্থান দখল করে। চারদিকে হইচই পড়ে গেল। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—**Pandit has done wonders**—'পণ্ডিত তাক লাগাইয়া দিয়াছে'। ইউরোপীয় অধ্যাপক ছাড়া এদেশীয় অধ্যাপক দিয়ে উচ্চশিক্ষা চলতে পারে না—এই ধারণা বিদ্যাসাগর ভুল প্রমাণ করলেন। সমগ্র দেশে প্রথম বে-সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কলেজ হিসেবে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) এবং তার রূপকার তথা পথিকৃৎ হিসেবে বিদ্যাসাগর অমর হয়ে রইলেন। এ জগতে কেউ সম-তালে পা ফেলতে না পেরে পিছিয়ে পড়ে একক; আবার কেউ-বা হিসেবনিকেশ লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা না রেখে দ্রুত বেগে এগিয়ে গিয়ে একক। বিদ্যাসাগর ছিলেন শেষোক্ত শ্রেণীর। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ—সকল বিষয়েই তিনি একক অগ্রণী; গড্ডালিকায় শামিল হয়ে যুগধর্মের দাস হন নি কখনো।

এফ. এ.-র পর বি. এ.। ১৮৭৯ সালে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটনে বি. এ. পড়াবার অনুমোদন চাইলেন। এবারে আর দয়া নয়, দাবি করলেন পূর্ববর্তী বছর-গুলিতে এফ. এ. পরীক্ষায় ছাত্রদের কৃতিত্বের জোরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে—

'95. Read a letter from Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, praying for the affiliation of the Metroplitan Institution upto B.A. standard.

Ordered—That an application be made to the Government of India recommending the Governor-General in Council to sanction the affiliation of the Metropolitan Institution upto the standard of the B.A. degree with effect from the 1st January, 1879.

(Minutes of Syndicate, dt. 18. 1. 1879)

তারপর থেকে অনার্স, এম. এ. এবং ল পড়াবার অনুমোদন লাভ তো গতানুগতিক ব্যাপার।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত পত্রে বিদ্যাসাগর লিখে-ছিলেন—'দেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের ব্যাপারে সরকারি কাজকর্মের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হল সত্য, তবু আমার বাকি জীবন এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। এ বিষয়ে আমার যে গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ আছে,

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা থাকবে এবং মৃত্যুর পরে তার অবসান ঘটবে।'

পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর আমরণ এই জীবনসত্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে মাতৃদেবী ভগবতীর নামে "ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপন করে 'মৃত্যুর পরে অবসান' এই পণ রক্ষা করে গেছেন। ১৮৫৩ সালে বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে যে জনশিক্ষার সূচনা, ১৮৯০ সালে সেই বীরসিংহ গ্রামেই ভগবতী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-মারফত দীর্ঘ ৩৭ বৎসরব্যাপী জনশিক্ষা-আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গদেশে বেসরকারি প্রচেষ্টায় শিক্ষা-প্রসারের পথিকৃৎ ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টার সফল পরিণতি তথা পুষ্টি ঘটে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। পরাধীন ভারতে এমন সব দূরদর্শী শিক্ষানায়ক পথ-প্রদর্শক থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতে আজ পর্যন্ত কোনো সুষ্ঠু শিক্ষানীতি নির্ধারিত হল না—একে জাতীয় দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যায়। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর শতবর্ষে একথা বিশেষ করে মনে পড়ে।

তথ্যসূত্র :

বিদ্যাসাগর রচনাবলী, বিদ্যাসাগর (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (বিনয় ঘোষ), বিদ্যাসাগর কলেজ শতবার্ষিকী স্মরণিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট, সিনডিকেট কার্য বিবরণী, ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই রচনাটি মুদ্রিত হল।

মহামারীর স্বরূপ সন্ধান

সুনীল সেনশর্মা

কোনো বস্তু, বিশেষ ঘটনা, বিশেষ ভাব, কার্যকারণ—অর্থাৎ বস্তুজগতের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি কিংবা কর্ম-কাণ্ডের বিশেষত্বের বোধগম্য রূপারোপের জন্য নির্দিষ্ট শব্দ চয়নের প্রয়োজন রয়েছে। শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ অনেক সময় ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখেই হয়ে থাকে, শব্দের প্রক্ষিপ্ত অর্থই প্রাধান্য পায়। এইসব শব্দ সমার্থক অথবা সমভাবদ্যোতক না হলে অনেক বিপত্তি ঘটে। এটা বিশেষ করে ঘটে এমন সব বিষয়ে যেখানে শব্দব্যবহারের বিশেষ অর্থ রয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিকৃতি কিংবা ভিন্ন প্রয়োগ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ধরনের ব্যবহারের হেরফেরে সমস্ত চিকিৎসাপদ্ধতিই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। নানা কারণে শরীরের তাপমান গড় মানের অধিক হলে "জ্বর" আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই তাপমান দেখে তাকে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েনজা অথবা আন্ত্রিক জ্বর বলে চিহ্নিত করার বিপদ যে-কোনো চিকিৎসকই স্বীকার করবেন। এটা একটা উদাহরণ। এমনি একটি উদাহরণ রয়েছে "মহামারী" শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহারে, বিশেষ করে এটির ইংরেজি প্রতিশব্দ "এপিডেমিক" শব্দটির ব্যবহারে। প্রচার-মাধ্যমে মাদক দ্রব্যাদির ব্যবহারের ক্রমবৃদ্ধি, যুব-সমাজে উত্তেজক ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহারের বিস্তৃত প্রসার, এমনকী রাস্তাঘাটে যানবাহনজনিত অত্যধিক দুর্ঘটনাকেও ওইসবের এপিডেমিক বলে বর্ণনা করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সাধারণত কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে যে অর্থে মহামারী শব্দটির ব্যবহার হয়ে আসছে, পূর্বোক্ত প্রয়োগে তার অর্থগত বৈষম্য এবং পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিকৃতি ঘটে লাক্ষণিক ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়েছে। যে-কোনো ঘটনার আধিক্য আর প্রসার এবং রোগজনিত অবস্থার আকস্মিকতা এবং বিস্তৃতি সমার্থক নয়—এটাও ব্যাখ্যার অপেক্ষা না রেখেই বলা যায়। তবুও এই ধরনের ব্যবহার

প্রবীণ বিজ্ঞানী সুনীল সেনশর্মা একজন ভূতাত্ত্বিক। কিন্তু তাঁর কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসার জগৎ বহুল বিস্তৃত। ভূ-তাত্ত্বিক হিসাবে নেফায় থাকাকালে তাঁর লেখা "ছায়াবৃতা" বইখানি একটি উপাদেয় গ্রন্থ। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটিতে মহামারী নিয়ে তাঁর ইংরাজি বক্তৃতা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে।

সামাজিক অনুমোদন পায়। একটু ভেবে দেখলে এই অনুমোদন যে শুধু আকস্মিক অথবা ঔদাসীন্য-উদ্ভূত নয়, সেটা বোঝা খুব কঠিন হবে না। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বোধ হয় এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও বটে। প্রকৃত মহামারীকে সাধারণত বিশেষ হৃদযাবেগের দৃষ্টিতে দেখা হয়—অসহায়তা, অক্ষমতা অথবা অপ্রতিরোধ্য আকস্মিক বিপদবোধ সেই সংজ্ঞানের মূলে রয়েছে। সমাজের কিছু ঘটনাকে সমাস্থরূপ হৃদয়াবেগ এবং সংজ্ঞানের পর্যায়ে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য অনেক সময় প্রকট হয়ে ওঠে মহামারী শব্দটির বিভ্রান্তিকর ব্যবহারে। মহামারীর ব্যাপক, বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্তফলের সম্ভাবনাকে হ্রাস করায় সামাজিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্বের গুরুভার কমানো এবং এড়ানোর যেন একটা প্রয়াস। এইসব কারণে সামাজিক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে মহামারীর গুণগত বৈশিষ্ট্য আর তাৎপর্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মহামারীর বাস্তবভিত্তিক সংজ্ঞা নিরূপণের মূলে রয়েছে আকস্মিক বহুমৃত্যু, ভীতি এবং অসহায়তা। কলেরা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ জাতীয় রোগের আকস্মিক আপতন এবং তার ফলে উজাড়করা মৃত্যু—এই যুগ্ম ঘটনার সঙ্গে মহামারীকে যুক্ত করা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে মহামারীর হঠাৎ আপতনের লক্ষণগুলিরও বৈশিষ্ট্য বিচার্য এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। মহামারী এককালীন এক-একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটা কোনো ঘটনার উতোরচাপান বিন্যাসের সূচক নয়। মহামারীজনিত সমস্ত ঘটনাই প্রকট এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য। প্রাণী-জগতের ক্রমবিকাশ এবং উত্তরণে দৃষ্টির আড়ালে যে ধরনের জৈবিক পরিবর্তন অত্যন্ত ধীরগতিতে ঘটে—তার সঙ্গেও এটা তুলনীয় নয়। নাট্যবিন্যাসের কিছু গুণগত সাদৃশ্য রয়েছে মহামারীর আপতন এবং পরিণতিতে। কোনো এক স্থানে হঠাৎ এক সময় মহামারী-রোগের সূচনা হয়, কিছুদিন ধরে এর তাণ্ডব জনজীবনকে বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত করে তোলে, ধ্বংস করে বহু জীবন, এবং তার পর ধীরে-ধীরে প্রশমিত হয়। মহামারীর তাৎক্ষণিক সময়ে সমাজের জনসাধারণের ব্যষ্টিক অথবা সমষ্টিগত আচরণ, ব্যবহার, গ্রামীণ অথবা শহুরে সমাজের অভ্যন্তরীণ অনাবৃত রূপটি প্রকট হয়ে পড়ে। সঙ্কটের উৎস, গতি, ফলাফল সম্বন্ধে ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত ভাব, ধারণা, বিপদের মোকাবিলায় তাদের ভূমিকা, কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যমূলক সততা এবং তৎপরতা, আদর্শ মূল্যবোধ, বিভিন্ন মতবাদের সংঘাত অথবা সমন্বয় ইত্যাদির পারস্পরিক যোগসূত্র তখন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। মহামারীর নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের এগুলি আর-এক দিক। সাংগঠনিক ক্রিয়াকাণ্ড, ব্যবহারিক কার্যকারণ, জাত-ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজের কাঠামো আর বুনটের উপর এইসব কিছুর প্রভাব, সাংস্কৃতিক দৃষ্টি-ভঙ্গির অকৃত্রিম রূপ ইত্যাদি মঞ্চের কুশীলবদের মতোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইসব কারণেই মহামারীর স্থান, কাল এবং সমাজের তাৎক্ষণিক রূপ সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে অনুসন্ধান, পর্যালোচনা এবং গবেষণার বিষয় হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সার্বিক রূপের বিবেচনা করে ইংরেজি এপিডেমিক রোগকে বাঙলা পরিভাষায় "জনপদিক" রোগ বললে বোধহয় যথার্থ অর্থবহ হয়।

মহামারীর আপতনে কী বিভ্রান্তিকর অরাজকতা এবং প্রাণান্তকর অবস্থারই না সৃষ্টি হয়! সমাজজীবন যেন বেচাল হয়ে পড়ে।

এমনি অবস্থার একটি বর্ণনা পাই আগ্রা শহরে ইনফ্লুয়েনজার আক্রমণকে কেন্দ্র করে। 'ইনফ্লুয়েনজা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধি নহে, "ডেঙ্গু" বলিয়া মানুষ কতকটা অবজ্ঞা ও উপহাসের চোখেই দেখিত। দিন দুই-তিন দুঃখ দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই, ইহাই ছিল লোকের ধারণা। কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার মহামারীরূপে সে যে দেখা দিতে পারে এ কেহ কল্পনাও করিত না। সুতরাং

এবার অকস্মাৎ ইহার অপরিমেয় শক্তির সুনিশ্চিত কঠোরতায় প্রথমটা লোকে হতবুদ্ধি হইল, তাহার পরেই যে যেখানে পারিল পলাইতে শুরু করিল। আত্মীয়-পরে বিশেষ প্রভেদ রহিল না, রোগে শুশ্রূষা করিবে কি, মৃত্যুকালে মুখে জল দিবার লোকও অনেকের ভাগ্যে জুটিল না। শহর ও পল্লী সর্বত্রই একই দশা, আগ্রার অদৃষ্টেও ইহার অন্যথা ঘটিল না, এই সমৃদ্ধ প্রাচীন নগরীর মূর্তি যেন দিনকয়েকের মধ্যেই একেবারে বদলাইয়া গেল। স্কুল কলেজ বন্ধ, হাটবাজারে দোকানের কপাট অবরুদ্ধ, নদীতীর শূন্যপ্রায়, শুধু হিন্দু ও মুসলমান শব-বাহকের শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে রাজপথ নিঃশব্দ জনহীন। যে কোনও দিকে চাহিলেই মনে হয় শুধু কেবল মানুষজনই নয়, গাছপালা, বাড়ি-ঘর-দ্বারের চেহারা পর্যন্ত যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।' দুটি শহরে দু-রকম মহামারীর প্রকোপে জনজীবনের একইরকম চেহারা, বিহ্বলতা, মহামারীর মূল কেন্দ্র থেকে দূরে পালিয়ে বাঁচার তাগিদ—নিজ-নিজ জীবনই সব থেকে মূল্যবান—"যঃ পলায়তি সঃ জীবতি"—এটাই একমাত্র লক্ষ্য ও মন্ত্র। জীবজগতের আদিমতম সহজাত বৃত্তির প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ। এই সময় মানুষের কুটিল মনের বিকৃত রূপ যেমন সাজানো গোছানো চেহারার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি আবার মূল্যবোধের কল্যাণ-রূপটিও কোথাও কোথাও আত্মপ্রকাশ করে জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। বিরাট আকারের বিপর্যয় সামাজিক বন্ধুরতাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার করে দেয়। 'এমনি যখন শহরের অবস্থা, তখন চিন্তা, দুঃখ ও শোকের দাহনে অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা রফা হইয়া গেছে। চেষ্টা করিয়া, আলোচনা করিয়া, মধ্যস্থ মানিয়া নয়—যেন আপনিই হইয়াছে। আজও যাহারা বাঁচিয়া আছে, এখনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারা সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয়; বহুদিন ধরিয়া যেখানে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সহসা পথে দেখা হইতে উভয়ের চোখেই জল ছলছল করিয়া আসিয়াছে—কাহারও ভাই, কাহারও পুত্রকন্যা, কাহারও বা স্ত্রী ইতিমধ্যেই মরিয়াছে—রাগ করিয়া মুখ ফিরাইবার মত জোর আর মনে নাই,—কখনও কথা হইয়াছে, কখনও তাহাও হয় নাই—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছে।' (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—"শেষ প্রশ্ন")

মহামারী-অধ্যুষিত জনপদের এই একটা রূপ—যেখানে বাঁচার তাগিদটা সবথেকে বড়ো হয়ে ওঠে। মহামারীর তাৎক্ষণিক প্রেক্ষিতে মানুষের সংস্কারের বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ মানুষের আর-এক দিকের চেহারাকে প্রকট করে তোলে।

'দেবু প্রশ্ন করিল—উপেন আজকাল গাঁয়ে ফিরেছে নাকি?—মরতে ফিরেছে বাবা। গাঁয়ে আগুন নাগাতে ফিরেছে। কাল থেকে গাঁয়ে গাজনের মেলা দেখতে এসেছে। আজ সকালে ফুলুরীর দোকানদার কতকগুলো তে-বাসী ফুলুরী ফেলে গিয়েছিল—সেনেটারীবাবু আসবে শুনে। রূপেন তাই কুড়িয়ে গবাগব খেয়েছে। খেয়ে সন্ধে থেকে 'নামুনে' হয়েছে।···

'নামুনে' অর্থাৎ কলেরা। সর্বনাশ! সম্মুখে এই বৈশাখ মাস—কোথাও এক ফোঁটা পানীয় জল নেই! এই সময় কলেরা।···'

'শুভ নববর্ষ। বৃদ্ধেরা শিহরিয়া উঠিল। নিতান্ত অশুভ প্রারম্ভ। রুদ্ররূপে মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে সঙ্গিনী মহামারীকে লইয়া। চণ্ডীমণ্ডপে বর্ষগণনা পাঠ ও পঞ্জিকা বিচার চলিতেছে। করিতেছে খোঁড়া পুরোহিত, শুনিতেছে শ্রীহরি ঘোষ এবং প্রবীণ মণ্ডলেরা।

'গত রাত্রির শেষভাগ হইতে বায়েনপাড়ায় তিন-জন আক্রান্ত হইয়াছে, বাউড়ীপাড়ায় দুইজন। উপেন মরিয়াছে।···বুড়ি রাঙাদিদি আজ সকালে ভগবানকে গাল দেয় নাই, সে জোড় হাতে তারস্বরে বারবার বলিতেছে—ভগবান, রক্ষে কর, হে ভগবান। দোহাই

তোমার বাবা। তুমি ছাড়া গরীবের আর কে আছে, দয়াময়? গেরাম রক্ষা করো বাবা বুড়োশিব! হে বাবা! হে ভোলানাথ! হে মা কালী!' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—"গণদেবতা")।

শুধু যে মহামারী সম্পর্কে মানুষের সংস্কারের অভিব্যক্তি ঘটে তা নয়, সুযোগ-সন্ধান এবং লোলুপতার আরও বিকৃত রূপ বেরিয়ে পড়ে। এক সময় প্রায় প্রতি দেশে মহামারীকে ঈশ্বরের রোষের বহিঃপ্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হত। সমাজে কোনো ব্যক্তিবিশেষের অথবা গোষ্ঠীর পাপাচরণ মহামারীকে আহ্বান করে অথবা মহামারীর স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কিছু মানুষের। সমাজের শীর্ষস্থানীয় কিংবা সঙ্গতিপন্ন মানুষের মধ্যে এই ধরনের বিশ্বাসের থেকে উদ্ভূত কর্মকাণ্ড সমাজকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। বেশির ভাগ সময়ই সমাজের সাধারণ মানুষই শিকার হয়। দেবতার রোষ প্রশমনের জন্য প্রশস্তি, পূজাপার্বণ—এটা মহামারীকালীন সমাজের অচ্ছেদ্য ক্রিয়াকাণ্ড ছিল। কুসংস্কারের চরম কুফল দেখা যায় দেবতাকে পারিতোষিক হিসাবে প্রাণীর বলিদান; এমনকী মহামারীর কারণ বলে ব্যক্তিবিশেষকে চিহ্নিত করে ডাইনি আখ্যা দিয়ে প্রাণ নেওয়ার খবর ক্ষেত্রবিশেষে এখনও শোনা যায়। মানুষের ভীতি, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পুরোহিত, ওঝা বা ওই-জাতীয় পেশাদাররা নিজ-নিজ বৃত্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ দৃঢ় করার ব্যাপারে বহু দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

সাহিত্যের উক্তিতে বাস্তবের উপস্থাপনার প্রচেষ্টাকে অযৌক্তিক ভাবতে পারেন কিছু লোক। সাহিত্য ইতিহাস নয়, কিন্তু বাস্তব জীবনের উপাদানেই তার সৃষ্টি—এই যুক্তিতে সাহিত্যকে বাস্তবের প্রতিবিম্ব ভাবার মধ্যে খুব অযৌক্তিকতা বোধ হয় নেই। কিন্তু একান্ত যাঁরা এটা মানতেও রাজি নন, তাঁদের জন্য ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণে মহামারীর ভূমিকা সম্পর্কে দু-চারটি ঐতিহাসিক উদাহরণ তুলে দেওয়া যেতে পারে।

কয়েক শতাব্দী আগেও ছোঁয়াচে রোগ এবং মহামারী এই ভূমিকা নিয়েছিল। মানুষের উদ্দেশ্য, কূটকৌশল, পরিকল্পনা—এই সবকিছুই মহামারীর প্রকোপে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল বারবার। "কালো মৃত্যু" (Black Death) বা প্লেগের মহামারীই বোধ হয় সবথেকে ভয়াবহ ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তখনকার পরিচিত দেশগুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল প্লেগজনিত মহামারীর কবলে। আবার ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে যে তিরিশ হাজার সৈন্যবাহিনী নেপল্‌স্ আক্রমণ করেছিল, টাইফাস্ মহামারীর ফলে তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য জীবিত রইল। ফরাসিদেশ ইতালিকে চিরতরে হারাল। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বেশ কিছু যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল মহামারীর প্রকোপে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ফরাসি বিপ্লবকে সমূলে বিনাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক প্রায় বিয়াল্লিশ হাজারের এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফরাসি দেশে অভিযান চালিয়েছিলেন। এক ভয়াবহ আমাশয় মহামারীর ফলে এই বাহিনীর প্রায় বারো হাজারের বেশি সৈনিক প্রাণ হারায়। ফ্রেডারিক তড়িঘড়ি পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এমন আর-একটি মহামারী ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের রাশিয়ার যুদ্ধাভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধকালীন প্রায় ষাট হাজার ইংরেজ সৈন্য টাইফয়েড মহামারীর শিকার হয়েছিল। মৃত্যু হয়েছিল প্রায় আট হাজার সৈন্যের। ঐতিহাসিকদের মতে, মধ্যযুগের বাঙলার সমৃদ্ধিশালী রাজধানী গৌড়ের পতন হয়েছিল মূলত ব্যাপক এবং বিধ্বংসী ম্যালেরিয়া মহামারীর ফলে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ম্যালেরিয়া এবং কলেরা মহামারী বারবার বাঙলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ উজাড় করে দিয়েছিল। বসন্ত রোগ তুলনীয়ভাবে অনেক পরে আত্মপ্রকাশ করে হাজার-হাজার মানুষের জীবন নিয়েছিল।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর রোগজনিত মহামারীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাবের ইতিহাস পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ইংল্যান্ডে কলেরা মহামারীকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য-বিষয়ক আইনের প্রবর্তন জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর প্রভাব পড়েছিল সাময়িক কালের বহু দেশের উপর।

বিগত কয়েক দশকে বিজ্ঞানে, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে, নতুন-নতুন ওষুধপত্রের আবিষ্কার এবং কার্যকারিতার উন্নতির ফলে বেশ কিছু মহামারী রোগের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের কিছু রোগকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, অথবা মহামারী পর্যায়ে এই ধরনের রোগের বিস্তারের সম্ভাবনাকে নিরমূল করা হয়েছে বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে ওই ধরনের কিছু রোগের নিয়মমাফিক প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি অপ্রয়োজনীয় বলে বাতিলও করা হয়েছে। মানুষের মনে এর ফলে একটা নিরাপত্তা এবং নিশ্চিন্ততার ভাব এসেছে। প্লেগ এবং বসন্ত এখন অতীতের দুঃস্বপ্ন বলেই মনে করতে শিখেছে লোকে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কিছু-কিছু রোগের পুনরাবির্ভাব লক্ষ করা গেছে। ম্যালেরিয়া যেন নতুন করে আবার ফিরে আসছে। প্রতিরোধী ব্যবস্থার শিথিলতা এসেছে এবং সময়ানুগ ব্যবস্থার অভাবে এই রোগ যে আবার মহামারীর রূপ নেবে না—এ কথা হয়তো জোর করে বলা যায় না। কারণ, যেসব ধারণা, অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে এইসব প্রতিরোধী ব্যবস্থার উদ্ভাবন—অনেক সময় দেখা গেছে যে সেইসব ব্যবস্থা কিছুকাল পরে আর উপযুক্ত রূপে কার্যকর হচ্ছে না। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদে ডি. ডি. টি. ব্যবহারের অন্তফল সম্পর্কে এটা বোধহয় সকলেরই আজ জানা।

মহামারীর এই দিকটা সমাজজীবনে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, আপামর জনসাধারণের সচেতনতায় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনো ক্ষেত্রেই এককালীন ব্যবস্থা স্থিতিমূলক হতে পারে না। সব সময় সজাগ এবং সচল অনুশীলন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থার রদবদলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই বক্তব্যের সম্যক উপলব্ধির জন্য মহামারীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যেসব কারণ জানা যায়, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার প্রয়োজন।

মহামারীর সূচনা হতে পারে যেসব কারণে—সেগুলি মোটামুটিভাবে এইরকমভাবে সাজানো যেতে পারে:

(ক) কোনো বিশেষ রোগবাহী ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় নি, এবং যার ফলে স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে উঠতে পারে নি, এমন কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে এদের অনুপ্রবেশ ব্যাপক মহামারীর সূচনা করতে পারে। ব্যাপক এবং বিপর্যয়কারী বহু প্লেগজনিত মহামারীর উৎস এই প্রক্রিয়ায়।

(খ) রোগবিস্তার করে এমন সব মারাত্মক পরজীবী-অধ্যুষিত অঞ্চলে বহিরাগত মানুষের হঠাৎ উপস্থিতির ফলেও মহামারীর বিস্তার সম্ভব।

(গ) খুব ক্ষতিকর নয় এমন কিছু রোগবিস্তারী জীবাণুর হঠাৎ গুণগত পরিবর্তনের ফলে তারা সময়-সময় মারাত্মক অনিষ্টকারক হয়ে ওঠে। এর ফলে আকস্মিকভাবে মহামারীর সূচনা ঘটে।

(ঘ) রোগবাহী জীবাণু যখন এক দেহ থেকে অন্য দেহে খুব সহজে প্রবেশ করতে পারে, তখন সেই রোগের ব্যাপকতা এবং বিস্তার মহামারীরূপে দেখা দেয়।

(ঙ) অনাহার এবং অপুষ্টির ফলে মানুষের রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পায়। এইসব গোষ্ঠী অতি সহজেই খুব সাধারণ রোগের দ্বারাও আক্রান্ত হয় এবং ব্যাপক রোগবিস্তারও খুব সহজ গতিতেই ঘটে।

মহামারী রোগ বিস্তারের প্রক্রিয়া এবং তার অনুকূল পরিবেশ মানুষের সমাজব্যবস্থা এবং জীবন-ধারণপদ্ধতির উপর কতখানি নির্ভরশীল—তা উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হবে। অপুষ্টি এবং তার ফলে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতার হ্রাস—অনুন্নত দেশগুলিতেই বিশেষ করে প্রকট। বিপর্যয়কর এবং মারাত্মক মহামারী এইসব দেশগুলিতেই বার-বার দেখা দিয়েছে—সেই ইতিহাসও অনেকেরই জানা আছে। বাঁচার তাগিদে স্থানান্তরে বা দেশান্তরে গমনাগমনের সঙ্গে কত রকম মহামারীর ইতিহাসই না জড়িত রয়েছে। মহামারী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলিই তাই সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে প্রতিষেধক কিংবা প্রতিরোধক ব্যবস্থা সফল হতে পারে না।

এই ব্যাপারটা আরও একটু খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে।

রোগসমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন (ক) যেসব রোগের প্রতিরোধ- বা প্রতিষেধক -ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে ব্যষ্টির আচারব্যবহার এবং জীবনধারণপদ্ধতির উপর। যক্ষ্মা, যৌন ব্যাধি, এবং অত্যাধুনিক এইডস জাতীয় রোগ এই-শ্রেণীভুক্ত। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে এই-জাতীয় রোগ সহজেই ছড়িয়ে যেতে পারে; এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অসাবধানতা রোগবিস্তারের সহায়ক হয়। (খ) সমষ্টিগত এবং সঙ্ঘবদ্ধ কর্মসূচীর দ্বারা যেসব রোগের প্রতিরোধ সম্ভব, যেমন টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি। এই ব্যাপারে ডাক্তার, জীবাণুবিশেষজ্ঞ, প্রশাসনিক গোষ্ঠী, এবং আপামর জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

কোন্ রোগ কিভাবে বিস্তারলাভ করতে পারে তার বৈশিষ্ট্য এই দুই ধরনের শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে মোটামুটি সূচিত করা হলেও মহামারীবিস্তারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তির ভূমিকাই প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্তত রোগের প্রাথমিক সূচনার সময় এটাই প্রধান। সেই কারণে, প্রতিটি স্তরের মানুষের সচেতনতা আর শিক্ষাই মহামারী-প্রতিরোধের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। মহামারীর ইতিহাস পর্যালোচনা এইজন্য বিশেষ করে প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন, শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন কী ভাবে মানুষ ব্যষ্টিগত অথবা সমষ্টিগত ভাবে মহামারীর মোকাবিলা করেছে। শুধু মহামারীর তাণ্ডবতার মধ্যেই নয়, শেষ হয়ে যাবার পরও সমাজ কী শিক্ষা গ্রহণ করেছে বা করতে আগ্রহী হয়েছে। অজস্র মানুষের অকাল এবং আকস্মিক মৃত্যু সমাজকে কিছু গ্রহণীয় শিক্ষা না দিয়ে কি নিষ্ফল হয়েছে। মহামারীর বিপর্যয়ের পর সমাজের আচারব্যবহার, বুনোট কি ঠিক আগের মতোই চলেছে—এই ধরনের মৃত্যুকে স্বাভাবিক এবং অপ্রতিরোধ্য ভেবে সমাজ কি নির্লিপ্ততায় মৌন রয়েছে? এইসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসা উচিত, এবং উচিত সম্যক পর্যালোচনান্তে ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর পরিকল্পনা নেওয়া। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও তো বার-বার লক্ষ করা গেছে। কেন এমনটি হয়, সেটাও ভাববার কথা।

বন্যা, খরা, প্লাবন জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো মহামারীও গোষ্ঠীসমাজকে বেসামাল করে দেয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের লক্ষণ এবং কারণ অনেক সময়ই জানা থাকা সত্ত্বেও এসবগুলির ব্যাপকতা এবং বিপর্যয় রোধে কর্মকাণ্ডের দুরূহতা মানুষকে অসহায় করে ফেলে। মহামারী রোগের ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড ঠিক ততটা দুরূহ নয়। কিন্তু অনেক স্থলেই রোগের প্রকৃত কারণ, উৎস এবং গতিপ্রকৃতির সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা অথবা স্বল্পজ্ঞান এবং ধারণা এইসব কর্মপদ্ধতিকে পরিচালনা করে। অস্পষ্ট, ভ্রান্ত এবং অপ্রকৃত ধারণা-প্রসূত কর্মকাণ্ড তাই অকেজো হয়ে পড়ে। এটা সর্ব স্তরের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহামারীর বিপর্যয়ের মুখে চিকিৎসাবিদ, বিজ্ঞানী, সমাজপ্রধান, শাসনকর্তা কিংবা সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং ব্যবহার স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের ধারণা আর জ্ঞানেরই অভিব্যক্তি। সাধারণ মানুষের মধ্যে কুসংস্কার, দ্বেষ-

দ্বিজের রোষে মহামারীর উদ্ভব এক সময়, সম্ভবত ক্ষেত্রবিশেষে এই যুগেও, সীমিত হলেও এইসব বিশ্বাস এখনও চালু রয়েছে। কার্যকারণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব, এবং অনেক সময় এই ধরনের বিশ্বাসকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা মানুষের কর্মকাণ্ডের পরিচালক হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে মাত্র এক শতাব্দী আগে প্লেগের প্রতিষেধক টীকা প্রচলনের বিরুদ্ধে যে তীব্র সামাজিক বাধার সৃষ্টি হয়েছিল—সেই ঘটনা এই ধরনের মানসিকতার একটা তিক্ত উদাহরণ হয়ে রয়েছে। ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ-তথ্যের আবিষ্কারক স্যার রোনাল্ড রস্ এই প্রসঙ্গে তাঁর ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় লিখেছেন—'এই সময় ভারতে প্লেগ রোগের আতঙ্ক প্রকৃতপক্ষে প্লেগের প্রতিষেধক টীকা নেবার আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল। হফকিন্সের আবিষ্কৃত এই টীকা বেশ কিছুকাল ধরেই বিভিন্ন দেশে ব্যবহার করা হচ্ছিল। কিন্তু বাতিকগ্রস্ত এবং বিক্ষোভসৃষ্টিকারী কিছু লোক বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটা সুযোগ পেয়ে অজ্ঞ সাধারণ লোককে এই টীকা নেবার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করল। তারা বলত যে, আসলে প্রতিষেধকের নাম করে সরকার মানুষের দেহে প্লেগের বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে বহু দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বিক্ষোভকারীরা তাদের অপপ্রচার চালিয়ে যেতে লাগল, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল করে দিল, এবং হাজার-হাজার লোকের মৃত্যু ঘটল এমন একটা রোগ থেকে যার প্রতিরোধ সম্ভব ছিল। এই সময় রক্তপরীক্ষার উদ্দেশ্যে শরীর থেকে রক্ত নেবার জন্য কোনো চিকিৎসকের ছুঁচ ফোটানোর চেষ্টাকে ব্যাহত করা হত এই বলে যে এটা মানুষের শরীরে প্লেগের বীজ ঢোকাবার অছিলা। আমার কলকাতা ত্যাগ করার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সৈন্য-বিভাগের প্রধান চিকিৎসক পরীক্ষার জন্য কোনো লোকের দেহ থেকে রক্ত নেবার কাজ থেকে আমাকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন।'

অজ্ঞতা এবং তার সুযোগ নিয়ে প্রচোরক গোষ্ঠীর অবৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের মারাত্মক ফল এমনি করে সমাজকে বার-বার ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

কিন্তু এই ব্যাপারে অন্যান্য তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং শাসক গোষ্ঠীর ভূমিকাও বহু ক্ষেত্রে সমান দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। স্যার রসের আর-এক অভিজ্ঞতায় এই প্রসঙ্গের সমর্থন রয়েছে। ১৯১৬ সালে ব্যাঙ্গালোরে ব্যাপক কলেরা মহামারীর প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—'রবার্ট কচ্ কলেরার কারণ আবিষ্কার করার ষোলো বছর অতি-বাহিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু "বিদগ্ধ বিজ্ঞানী" কচের এই আবিষ্কারকে বিশ্বাস করতেন না। এবং এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারত সরকারের নিয়োজিত সরকারি অনুসন্ধানকারী। লোকে এখনও বুঝতে পারছে না যে রাম, শ্যাম কিংবা যদু সব সময় প্রকৃত বিজ্ঞান-অন্বেষক হতে পারে না। এই ধরনের অন্বেষকরা প্রায়শই নতুন কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের ক্ষমতা বা প্রতিভাসম্পন্ন তো হনই না, অন্যের আবিষ্কারের মর্মার্থ অনুধাবন করার মতো মানসিকতাও তাঁদের থাকে না। সরকার এই ধরনের রাম-শ্যাম-যদুকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করে তাদের প্রকৃত বৈরজ্ঞ বলে ভারতে শুরু করে। এই ধরনের ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত ধারণার কুফল-স্বরূপ ভারতবর্ষে রবার্ট কচের আবিষ্কার এত বছর ধরে অস্বীকৃত রয়ে গেল। এবং এই ষোলো বছরে এই আবিষ্কারের অস্বীকৃতি এবং তা প্রয়োগ না করার ফলে প্রায় ৮০ লক্ষ ভারতবাসী কলেরায় প্রাণ হারিয়েছিল।' ব্যাঙ্গালোরে কলেরা মহামারীতে সরকারি কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বীতশ্রদ্ধ উত্তেজিত স্যার রোনাল্ড রস্ ঘোষণা করলেন—'যেসব রাজনীতিবিদ্ প্রায়ই জন-সাধারণের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানকে হেয় এবং অবহেলা করেন, আমি তাঁদের গলা ধাক্কা দিয়ে ভারতবর্ষের কলেরা-অধ্যুষিত অঞ্চলে নিক্ষেপ করতে

চাই, নিক্ষেপ করতে চাই স্তূপীকৃত নোংরা এবং জঞ্জাল-এর মধ্যে যার সৃষ্টি হয়েছে তাদের অনিষ্টকর আইন এবং দুর্বল শাসনব্যবস্থার ফলে। আমি শুধু ইংরেজ রাজনীতিবিদদের কথাই বলছি না, বলছি ভারতীয় রাজনীতিবিদদের কথাও, যাঁদের মধ্যে আছেন পৌর সভার অধ্যক্ষ ইত্যাদিরা। এঁরা সকলেই সমগোত্রীয়। বর্তমান মহামারীর প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলা যায় যে এইসব লোকের বহুদিনের অবহেলার ফলে এই ধরনের ঘিনজি লোকালয় এবং আবর্জনার স্তূপ বছরের পর বছর বেড়ে চলেছিল। প্রতিটি গৃহে বিষের কুণ্ড—বিজ্ঞান এইসব ক্ষেত্রে অকেজো হয়ে গেছে—কিছুই করা সম্ভব হয় নি।'

১৮৭২ সালের জুন মাসের ইনডিয়া মেডিকেল গেজেটে ম্যালেরিয়া মহামারী সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপলব্ধির স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, 'কোথাও কখনই প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী রোগ ইত্যাদির আপতন ঘটে, তখনই অজস্র তাত্ত্বিক-এর সমাবেশ লক্ষ করা যায়। এঁরা স্ব-স্ব সংজ্ঞা এবং ধারণানুযায়ী এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। এইসব তাত্ত্বিকদের শ্রেণীবিন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকেন অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী গোষ্ঠী। এঁরা মনে করেন—মানুষের কোনো পাপকর্মের ফলে রুষ্ট দেবদেবীর অভিশাপই এইসব বিপর্যয়ের কারণ। রাজার পাপে দেশের সর্বনাশ—ভারতে এটা একটা বেশ জনপ্রিয় প্রচলিত বিশ্বাস।

এর পরবর্তী গোষ্ঠী হল তুরীয়বাদী। এঁরা এইসব ঘটনার কারণ খোঁজেন অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে। সূর্য, নক্ষত্র, চন্দ্র অথবা নভোমণ্ডলের অশুভ প্রভাবকেই এঁরা দায়ী করেন এইসব ঘটনার জন্য। আপাতসম্পর্কযুক্ত কোনো সদৃশ লক্ষণ, ঘটনা অথবা ইঙ্গিতের সাহায্যে কার্যকারণের ব্যাখ্যা করে থাকেন এই গোষ্ঠীভুক্ত তাত্ত্বিকেরা। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরের উপাদান যে-তত্ত্বে যত বেশি পরিমাণে উপস্থিত, সেইসব তত্ত্বের গুরুত্ব তত বেশি হয় সাধারণ মানুষের কাছে। তত্ত্বের অস্পষ্টতা মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে আরও বেশি প্রভাবিত করে। এই ধরনের তাত্ত্বিকদের মধ্যে আত্মাভিমানী, যুক্তিহীন তার্কিক এবং ভাবগ্রাহীদের ভিড়। এঁরা অন্যের মতকে নিজের বলে চালিয়ে, যুক্তিকে তর্কের আড়াল করে, নিজেদের গরিমা প্রচার করে এইসব বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট।

'সর্বশেষের দলে রয়েছেন খাঁটি মানুষ। এঁরা বিনয়ী, যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবকিছুর বিচার করতে আগ্রহী এবং অগ্রণী। প্রতিটি তথ্যকে খুঁটিয়ে বিচার করা, যুক্তিগ্রাহ্যহীন তথ্যকে বর্জন করা, নিজের ভুল স্বীকার করার সৎসাহস নিয়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ এবং উপস্থাপনা করা এঁদের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত জীবন ধরে এঁরা সত্যের সন্ধান করতে পরাঙ্মুখ নন, কিন্তু সত্য গোপন করা অথবা অস্বীকার করার প্রবনতা এদের চরিত্রের বহির্ভূত।'

কিন্তু মহামারী প্রতিরোধ বা প্রতিষেধকের কাজে শুধু এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছাড়াও আরও কিছুর প্রয়োজন। মহামারী রোগগুলির দ্বারা জানপাদিক এক বিশাল জনগোষ্ঠী একই সময়ে আক্রান্ত হন। মহামারীরোধী যে-কোনো কর্মসূচীর রূপায়ণে জনজীবনের সক্রিয় ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে কোনো কর্মসূচীর সাফল্যই আশা করা যায় না। এই ব্যাপারে যেসব বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেগুলি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা চলে।

প্রথমত, রোগের উৎপত্তি এবং বিস্তারে জীবাণু-বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন। এর ফলে সম্ভব হয় প্রতিরোধব্যবস্থার রূপারোপ এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে স্পষ্ট কর্মসূচী নেওয়া।

দ্বিতীয়ত, প্রতিরোধব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে উপযুক্ত গণসংস্থার প্রয়োজন—যার মাধ্যমে কর্মসূচীকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

তৃতীয়ত, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে চিকিৎসার

সুযোগ পৌঁছে দেওয়া গণচেতনার বহিঃপ্রকাশ। চিকিৎসাবিদ্যা এবং পেশার এটা ঐতিহাসিক মৌলিক উপলব্ধি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, চিকিৎসা-বিদ্যার অনুশীলনে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি কোনো সময়ই যথেষ্ট গুরুত্ব পায় নি। পেশাগতভাবেও এই বিষয়টি অন্তত আর্থিক ক্ষেত্রে লাভজনক নয়। সাধারণত জনস্বাস্থ্যের কাজে ব্যাপৃত চিকিৎসকদের বেশ অমর্যাদার চোখেই দেখা হয়ে থাকে। এই ধরনের চিকিৎসকরা সাধারণত সরকারি সংস্থার অধীনেই কাজ করে থাকেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শীদের জগৎ থেকে এই ধরনের চিকিৎসকরা যেন জাতিচ্যুত—অন্য এক গোষ্ঠী, ব্রাত্য সম্প্রদায়। বিভিন্ন দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুশীলনের ধারা, পাঠ্যক্রম, পেশাগতভাবে লাভজনক আরোগ্যকর চিকিৎসাপদ্ধতির উত্তরোত্তর প্রাধান্য ইত্যাদির ইতিহাস এবং উত্তরণ পর্যালোচনা করলে এই ব্যাপারটার সমর্থন পাওয়া যাবে। শুধু ভারতেই নয়, বহু দেশেই এটাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের রূপ এবং পেশাগত বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এখনও রয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুশীলনের গুণগত আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না। অন্তত মহামারী রোগের মোকাবিলার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জনস্বাস্থ্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চতুর্থত বলা চলে যে জনস্বাস্থ্য এবং প্রশাসনিক কর্মসূচীর সম্যক এবং কার্যকর ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় প্রবর্তন একটা দেশের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সদুদ্দেশ্য এবং সমাজের স্থিতিশীল সুস্বাস্থ্যযুক্ত জনসাধারণের সার্বিক উন্নতির প্রশ্ন। প্রকৃত শিক্ষা এবং জনশিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব সর্বশ্রেণীর মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি করা।

এবং সবশেষে বলা যায় যে, মহামারীর সমস্যা শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এটা আরও বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা, উপলব্ধির বিকৃতি এবং অপ্রাসঙ্গিকতার সমস্যা। মহামারী সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক, অভিজ্ঞান, উপলব্ধি, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা, সমাজে মানুষের প্রতিক্রিয়ার তথ্যগত ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়। বিচ্ছিন্ন এবং তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আজও, বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও, মহামারীকে অতীতের দুঃস্বপ্ন বলে এড়িয়ে যাওয়া চলে না, সেটা এখনও বাস্তব সত্য।

সূত্রাবলী :

১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শেষ প্রশ্ন।

২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—গণদেবতা।

৩. Daedalus (Journal of the American Academy of Arts and Sciences)—Vol. 118, No. 2 (1989)—Living with Aids.

৪. —Do— Vol. 115, No. 2 (1986)—America's Doctors, Medical Science, Medical Care.

৫. Ronald Ross : Memories with a full account of the great Malaria Problems and its solution. John Murray, London (1923).

নসিবিবির ঝুড়ি

এ. মান্নাফ

শিউলিপুরের পুবপাড়ে চাপা দেওয়া আছে নসিবিবির ঝুড়ি। প্রথম ঝুড়িটা নিজের হাতে চাপা দিয়ে গেছে নসিবিবি। বাঁশের ঝুড়ি। খুব বড়োও নয়, আবার খুব ছোটোও নয়। মাঝারি।

জলে ভিজে, রোদে পুড়ে ঝুড়ির অবস্থা হয়েছিল সঙ্গীন। গত বছর আবার বর্ষার জলে ধসে মিশে গেছে মাটিতে। কিন্তু একই মাপের নতুন ঝুড়ি চাপা দিয়েছে গাঁয়ের মেয়েরা। তেলসিঁদুরের আঁক পেড়েছে ঝুড়িতে। সন্ধ্যায় প্রদীপ দেখায় তারা। এর জের চলবে নসিবিবি না ফেরা পর্যন্ত।

—তা নসিবিবি ফিরবে কবে?

—ঠিক দিনটি—বলা মুশকিল।

তবে ঝুড়ি নিয়ে এমন আদিখ্যেতা—আগে কখনও শোনা যায় নি। চোখেও দেখেছে, জোর করে এমন কথা বলতে পারে না কেউ। বিশেষ করে মুসলমান গাঁয়ে ঝুড়ি-চাপা! ছিঃ!

মসজিদের নতুন ইমাম জালাল সাহেব শিউলিপুরের ব্যাপার-স্যাপার দেখে থ। এরা কি মুসলমান! ইসলামের কোনো তরিকার সাথেই পরিচয় নেই এদের। জালাল সাহেব ঘুরে-ঘুরে বেড়ালেন, খোঁজ-খবর নিতে। যত ঘুরছেন, যত দেখছেন, তাজ্জব বনে যাচ্ছেন।

শিউলিপুর আর রতনপুর—পাশাপাশি গ্রাম। এপাড়া ওপাড়া আর কি। মাঝে কয়েক বিঘে জমির দূরত্ব। শিউলিপুরে মুসলমান ভরতি, আর রতনপুরে হিন্দু-মুসলমান আধাআধি। রতনপুরে আলাদা মসজিদ নেই। শিউলিপুরের মসজিদের শরিক তারা। রতনপুরে হাহাকার নেই, অবস্থাপন্ন মানুষের গাঁ। আর শিউলিপুরের অবস্থা? ছ্যা-ছ্যা। দীন-দুঃখী খেটে-খাওয়া মানুষে ভরতি। রতনপুরে রত্নও আছে। নফর মিঞা, সুধীর সরকার—মস্ত ধনী। রতনপুরের রত্ন এরা। সুধীর সরকার বিড়ি ফ্যাকটরির মালিক। শিউলিপুরের বহু মানুষ বিড়ি বাঁধে এখানে। আর

নফর মিঞা জোতদার। নামে-বেনামে প্রচুর জমি। পার্টির নেতা। টাকা দিয়ে বেঁধে রেখেছে পার্টিকে। ওর গায়ে আঁচড় কাটে কার সাধ্য। দূর থেকে সেলাম করে লোক।

শিউলিপুরের নতুন মৌলভী ধর্মের সেবায় নিষ্ঠাবান। তিনি জানেন ঝুড়িপুজা গুনার কাজ। গাঁয়ের মানুষকে এই কথা বোঝাবার জন্য একদিন সকালেই বেরিয়ে পড়লেন জালাল সাহেব। মধ্যবয়সী। শ্যামবর্ণ, মুখভরতি কাঁচা দাড়ি। একহারা স্বাস্থ্য। পরনে লুঙ্গি, গায়ে লম্বা ঝুলওয়ালা নীল পানজাবি। গাঁয়ের শেষে এসে নওশাদের সঙ্গে দেখা। একেবারে মুখোমুখি। নওশাদের মাথায় ছাতা, খালি গা, পরনে হাঁটু অব্দি লুঙ্গি। সালাম জানালেন জালাল সাহেব। নওশাদ উত্তর দিল কি না, বোঝা গেল না। সেদিকে গ্রাহ্য না করে জালাল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়ে সব ক্যা হোতা হ্যায়?'

জালাল সাহেব বাঙালি। তবু ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করতে গেলেই জিভের ডগায় দু-এক টুকরো হিন্দি-উর্দু শব্দ নাচন শুরু করে।

নওশাদ বোবা। তার দু-চোখে বিস্ময়। কী বলতে চায় মৌলভীসাহেব—ধারণার বাইরে।

জালাল সাহেব সুযোগের সদ্ব্যবহারে ওস্তাদ। উপদেশ দিতে শুরু করলেন—'আল্লাতালার তো কোনো শরীক নেই। তাই আল্লা ছাড়া আমরা অন্য কাউকে পুজা করতে পারি না।'

কাঁচুমাচু মুখে নওশাদ জানাল—জমির পানি বেরিয়ে যাচ্ছে মৌলভীসাহেব, আমি যাই। দ্রুত হাঁটতে শুরু করল অনুমতির প্রতীক্ষা না করেই।

কিন্তু মৌলভীসাহেবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। নওশাদের প্রস্থানের সাথে-সাথে সাবের আলির প্রবেশ। কাঁধে বস্তা, হাতে কাস্তে। বয়স্ক মানুষ। এবার সাবের আলিই সালাম জানাল। জালালসাহেব খুশি। দন্ত বিকশিত করে সালামের জবাব দেন :

—ওয়া আলাইকুম্-আস্সালাম।

—ইয়ে সব ক্যা হোতা হ্যায়, সাবের ভাই।

—কী হয়েছে!—সাবের আকাশ থেকে পড়ে।

—এ গাঁয়ের আওরতরা ঝুড়িপুজা করে?

এবার সাবের বুঝতে পারে কী কথায় কী এসে যাবে। তাই সে শুধু বলে,

—বড়ো দেরি হয়ে গেল, রোদ বেড়ে যাচ্ছে, ঘাস কাটতে হবে—বলেই সে কেটে পড়ে।

বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকেন মৌলভী সাহেব। আশ্চর্য। এ গাঁয়ের পুরুষগুলো কী? এরা কি আওরতদের ভয়ে ভীত? শরীয়ত নিয়ে কথা উঠলেই চুপচাপ পালিয়ে যাবার ধান্দা করে। জালাল সাহেবের কৌতূহল বেড়ে যায়। শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর ঝড় তুললেন মসজিদে। উপদেশ দিতে শুরু করলেন—ঝুড়িতে সিঁদুর দেওয়া, সন্ধ্যায় প্রদীপ দেখানো—না-জায়েজ, না-জায়েজ। ইসলাম ধর্মে হারাম। বন্ধ করো, এসব না-ফরমানি কাম। নইলে জাহান্নাম, জাহান্নাম···।

গমগম করে ওঠে মসজিদের ভিতর-বাহির। নামাজিরা নীরব। টুপিঢাকা মাথা ঝুঁকে পড়ে। তাজ্জব ব্যাপার!

জালাল সাহেবের কর্তব্যজ্ঞান তীব্র হয়ে ওঠে। নামাজের পর তিনি ঢুকে পড়লেন আবার গাঁয়ের ভিতরে। প্রবল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়ালেন নসিবিবির ঝুড়ির কাছাকাছি। জালাল সাহেবকে নিয়ে কানাঘুষোর সংবাদ আগেই পৌঁছেছিল—তার বিরক্তির কথা কানাকানিতে চাউর হয়ে গিয়েছিল।

শিউলিপুরের মেয়েরা নসিবিবির শিষ্যা। প্রায় সকলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর এবং আত্মরক্ষা করতে সক্ষম। মেয়েরা ঘিরে ধরল মৌলভী সাহেবকে মুহূর্তের মধ্যে।

শিউলিপুরের আগের মৌলভী ছিলেন বড়ো চুপচাপ। নিরীহ মানুষ। নামাজ পড়িয়েই কর্তব্য শেষ। গাঁয়ের ঝগড়া-বিবাদ-দলাদলিতে তিনি থাকতেন না। কাজ

ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু নতুন মৌলভীর গায়ে দেওবন্দের লেবেল। শরীয়ত প্রতিষ্ঠাই তাঁর আদর্শ। ভয় পাবার পাত্র তিনি নন।

চোখ ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখে নিলেন। জনা আট-দশ মহিলার মাঝে তিনি বন্দী। তাদের চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি।

উপদেশ দিতে শুরু করলেন —

—মা, বোহীন, শুনিয়ে। আল্লাতালার কোনো শরীক নেই।···

মেয়েরা শাড়ির আঁচল কোমরে জড়াল শক্ত করে।

—শিউলিপুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও এ ঝুড়ি —গমগম করে উঠল মৌলভী সাহেবের গলা।

ফোঁস করে উঠল জোহুরা খাতুন। জোহুরা তিন ছেলের মা, মধ্যবয়সী—গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। স্বাস্থ্য ভালোই। চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল—

—আল্লা কি অত্যাচারী, জুলুমবাজের হাত থেকে আওরতদের রক্ষা করে?

চমকে উঠলেন মৌলভীসাহেব। এমন কথা আগে শোনেন নি তিনি। ভেবেছিলেন—গাঁয়ের মেয়েরা সব বোকাসোকা। এমন পালটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ভাবেন নি। তবে তিনিও হাল ছাড়ার মানুষ নন। যুক্তিতর্কের মারণ-অস্ত্রগুলি পরপর সাজিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পুনরায় নামলেন নিজেকে শক্ত করে। বোঝাতে চাইলেন ধীর কণ্ঠে—ঝুড়িতে সিঁদুর লেপন, তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখানোর মতো ঝুড়িকে প্রদীপ দেখানো—না জায়েজ।···

পালটা প্রশ্ন জোহুরার :

—বহাল তবীয়তে প্রথমা স্ত্রী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও দুসরী বিবি করা কি মুসলমান ধর্মে জায়েজ আছে?

চুপ করে থাকেন জালালসাহেব। কী জুতসই উত্তর দেবেন ভাবতে-ভাবতেই আবার প্রশ্ন আসে—

—আল্লা কি বান্দার আনা মসীবত থেকে আমাদের বাঁচায়?

এতক্ষণে মনোমত প্রশ্ন পেয়ে উত্তর এসে যায় ঠোঁটে :

—মসীবত দূর করনেওলা হলেন আল্লা। তিনি তো সবকিছুর মালিক।

—দুষ্ট স্বামী যখন পরস্ত্রীর লোভে নিকা-করা বিবিকে পেটায়, বাড়তি টাকা বাপের ঘর থেকে না আনতে পারায় কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারে বিবিকে, মেয়েদের অভাবের সুযোগ নিয়ে কিছু লম্পট পুরুষ যখন ইজ্জত কেনার মহাজনি কারবার ফাঁদে—বলো, মৌলভী, বলো—তখন কি আল্লা মসীবত দূর করার জন্যে সামনে এসে দাঁড়ায়? শয়তানকে শায়েস্তা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়···? চুপ করে থেকো না, জবাব দাও। কাঁপতে থাকে জোহুরা।

মিনমিন করে বলে উঠলেন জালালসাহেব, জরুর হাত বাড়ায়। সরাসরি নয়। কারো মাধ্যমে আল্লা মসীবত দূর করেন।

—যে লোক আমাদের মসীবত দূর করে, তাকে সরাসরি অপমান করার কথা কোরান হাদীসে কি উল্লেখ আছে?

—ছিঃ তোওবা। তাই কি কখনও থাকে?

—তাহলে তুমি নসিবিবির ঝুড়ি পানিতে ফেলে দিতে চাইছ কেনে?

জোহুরার চীৎকারে বাঁশের মাথায় বসে-থাকা পাখি ডানায় ঝাপট মারে। জোহুরাকে থামায় কার সাধ্যি?

জালালসাহেব ভাষা হারালেন। দাঁড়িয়ে রইলেন চুপটি করে। নজর দিলেন ঝুড়ির দিকে—কী আছে ওর ভেতর? এর মাহাত্ম্য কী?

—এই ঝুড়ির দিকে তাকাবে না গো, মৌলভী। ধমকে উঠল জোহুরা। এটা যার ঝুড়ি, সেই একমাত্র এটা তুলতে পারবে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। নারীবেষ্টিত পরিবেশ মোটেই সুস্থ পরিবেশ নয়। যাবার আগে বিষদৃষ্টিতে

তাকালেন ঝুড়ির দিকে। একটা লাথিই যথেষ্ট। ঝুড়ি গড়িয়ে পড়বে পুকুরে। পুকুরটিতে গর্ত আছে, খরাতেও জল মরে না। রঙ বদলায়। চারিদিকে তাল আর বাঁশগাছের মেলা। আগে রতনপুরের নফর মিঞা তাড়ি লাগাত তালগাছে। পাড়ে বসেই তাড়ি খেত; মদমাতাল লেগেই থাকত গ্রামে।

তালগাছের মাথায় পুরুষমানুষ থাকলে, মেয়েরা ঘাটে বসে কী করে? লজ্জা নিয়ে টানাটানি।

নসিবিবি বঁটি হাতে গাছের গোড়ায় দাঁড়ায়। হুঙ্কার ছাড়ে,

—যে উঠবে তালগাছে, ঠ্যাং কাটব তার। তাড়ি লাগানো চলবে না।

—এ কি মগের মুল্লুক যে গাছে চড়তে পারব না। দেখে নেব নসিবিবিকে। তারা নালিশ রাখল নসিবিবির স্বামী ইয়াকুবের কাছে। চোখ রাঙিয়ে শাসানি ছুঁড়ল :

—ইয়াকুব, সতর্ক কর্ তোর বিবিকে। কাজটা কিন্তু ভালো করছে না।

নসিবিবি ইয়াকুবের আদরের ধন। নসিবিবিকে সে কখনও খারাপ কাজ করতে দেখে নি। তবু একবার অনুরোধের সুরে বলল—

—নসি, ঝামেলা পাকায়ে কী লাভ?

ভাতের থালা বাড়িয়ে দিয়ে, সরাসরি মুখ তুলে চাইল :

—এটাকে তুমি ঝামেলা বলতিছ? এ গাঁয়ের মেয়েদের ইজ্জত গাছের উপর থেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখুক—এটা তোমরা চাও?

প্রশ্ন সকল পুরুষের কাছে।

ইয়াকুব শান্ত মানুষ কিন্তু ন্যায়পরায়ণ। ভাতে হাত রেখে জোরের সঙ্গে বলল,

—না! না! তাই কি কখনও হয়?

—ব্যাস—তাড়ি লাগানো বন্ধ।

জালাল সাহেব বেরিয়ে এলেন নারীবেষ্টনীর থেকে। মেয়েরা শুধু ক্রোধই প্রকাশ করেছিল, আর কিছু করে নি। তবে নসিবিবির ঝুড়ির উপর কোনো অপমানজনক আচরণ করলে, জালালসাহেবের অবস্থা কেমন হত, তা ঠিক বলা যায় না। জালালসাহেব ফিরে এলেন ক্ষুণ্ণ মনে। একটা মেয়ের নামে এমন ঐক্য নিঃসন্দেহে বিরল।

নসিবিবি কে? তার সঙ্গে দেখা করা দরকার। বিপত্নীক দিলদারসাহেব, বয়স্ক মানুষ। অবসর সময় মসজিদেই কাটান। স্বল্প কথার মানুষ।

জালালসাহেব জানতে চাইলেন,—দিলদারসাহেব, আমি নসিবিবির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক।

—হবে না। টুপ করে জবাব দিয়ে, গুম হয়ে গেলেন। ব্যাপার বড়ো রহস্যময় হয়ে ওঠে মৌলভী-সাহেবের কাছে।

নসিবিবির স্বামী ইয়াকুব। ভোলাভালা মানুষ। ইয়াকুব বিড়ি বাঁধে, বিড়ির বাঁধুনিতেই তার সংসার চলে। ছোটো সংসার, ডালপালা নেই। পনেরোতে বউ হয়ে এসেছিল নসি, দশ বছর অতিক্রান্ত। কোনো ছেলে বা মেয়ে তাদের ঘরে আসে নি। এ-নিয়ে নানা কথা নিন্দুকের ঠোঁটে।

নসিবিবি স্পষ্ট কথার মানুষ। তাই একদিন সরাসরিই জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁ গা, ছেলের মুখ দেখাতে পারলাম না—তুমার মনে কোনো দুঃখ নাই তার জন্য?

—হঠাৎ একথা জিগাস ক্যান?

—পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়।

—আল্লা ছাওয়াল না দিলে হবে কেমনে? এ নিয়ে এত ভাবিস কেনে?

নসিবিবির স্বামীকে নিয়ে আর কোনো দুর্ভাবনা থাকে না। পতিসোহাগে মনটা তার কানায়-কানায় ভরে ওঠে।

শিউলিপুরের নসিবিবিকে আপনারা দেখেন নি। আপনারা হয়তো বলবেন এমন নসিবিবি হাজার গণ্ডা।

ইনি কোন্ জন? এই নসিবিবি অন্য নসিবিবির থেকে কিন্তু আলাদা। একটু পরিষ্কার করেই বলি।

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা। টানা-টানা চোখ। অদ্ভুত কমনীয়তা চোখে-মুখে। আশ্চর্য! এমন মেয়ের ভিতরে সংগ্রামের কাঠিন্য থাকে কী করে?

নসিবিবিকে ঝুড়ি চাপা দিতে দেখলেই, আতঙ্ক জাগে সকলের। জানা কথা, একটা কিছু তোলপাড় হবেই।

নসিবিবির স্বভাবটাই আলাদা। সহনশক্তি অসীম। নিজের স্বার্থে কারো সাথে কোনো ঝগড়া নেই। যত ঝগড়া, বিবাদ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অন্যায় রুখবার জন্য যখন সে তৈরি হয়, তখন সে অন্য নসিবিবি। তখন ওর দেহে মনে কম্পন সৃষ্টি হয়। ওর চালচলনে অন্য একটা মানুষ যেন ইস্পাতের ফলার মতো ঝলসে ওঠে।

উঠোনের তারে শাড়ি মেলতে-মেলতে জারিনার মা চীৎকার করে বলল,

—ও নসু, ঘরে আছিস?

—কী বুলছিস?

—রান্না হল?

—চুলোতে ডাল ফুটছে।

—ভাত খেয়ে একবার আসবি রে আমার ঘরে?

—কেনে?

চোখের ইশারায় হাত নেড়ে জানাল—জামাই এসেছে।

—আচ্ছা ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

চোখমুখের চেহারাই পালটে গেল নসিবিবির। নসির চরিত্র ইয়াকুবের নখদর্পণে। বুঝল সে আজ নসি সংগ্রামী মূর্তি ধরবে। পরের ঝামেলায় জড়াতে নসি ওস্তাদ।

বিড়ি টানতে-টানতে জানতে চাইল—জারিনার মা তুকে ডাকলে কেনে?

—তুমার শুনে কী কাম?

—বল না, নসি!

—ওর জামায় এসেছে।

—তাতে তোর কী?

—ও হারামি জারিনাকে ফেলে দুসরী নিকা করার ধান্দা করছে। তাই তো জারিনা রাগ করে চলে এসেছে মায়ের ঘরে।

—ও বিয়ে করলে তোর কী?

দপ করে জ্বলে ওঠে নসিবিবি। জারিনা কি দেখতে খারাপ। ওর মুখ, নাক, চোখ, দেহের গঠন কি কিছু খারাপ? অকারণে দুসরী বিয়ে করবে কেনে?

—নসি—তোর দাবি ঠিক, কিন্তু করবি কী? যাদের ক্ষমতা আছে, ধর্ম-টর্ম তাদের জন্যে নয়। ধর্মের আইন সব গরিবদের জন্যে। রতনপুরের নফর মিঞার কাণ্ডটা দেখ। নতুন-নতুন মেয়ে আনছে পয়সার জোরে। নেশা ভাং খাচ্ছে। কেউ তো তাকে ধর্মের কথা শুনাতে যায় না। ধর্মের বাণী সব গরিবের কানে! ওইসব লোকের কিছু করতে পারবি না নসি, যাসনে···

—দেখো না কী করি।

খাওয়া সেরে ঝুড়ি চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে নসিবিবি। ঝুড়ি চাপা দিলেই, বদলে যায় নসিবিবি। ওর তখন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন মূর্তি, কোনো ঐশী শক্তি ভর করে না তো? নইলে নসিবিবির এত শক্তি এত সাহস আসে কোথা থেকে? ঝুড়ি চাপা দিয়ে বেরিয়ে এলে নসিবিবিকে রুখবে কে? একটা হেস্তনেস্ত করা তার চাই-ই।

জামাই তখন খাওয়া সেরে লম্বা হয়েছে। বিড়ি টানছে। জারিনা বসেছিল পাশেই। নসিবিবি কাছে আসতেই উঠে বসে। মিনমিন করে ওঠে—চাচি আসেন।

নসিবিবি কোনো ভনিতায় না গিয়ে খপ করে তার একটা হাত ধরে বলে উঠল,

—এসব কী শুনছি? কঠোর কণ্ঠস্বর। কাঁপিয়ে দেয় ভিতরটা। জামাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

চেপে ধরে নসিবিবি—কী হল, জবাব দাও। জামাইয়ের কণ্ঠনালী ভয়ে শুকিয়ে কাঠ। শব্দ বেরোবে কী করে?

—জারিনাকে ফেলে আবার নিকা করতে চাইছ কেনে?

—ঠিক তা নয়। জামাই আমতা-আমতা করতে থাকে।

—তাহলে জারিনা পালিয়ে আসে কেনে?

—সেইজন্যই তো নিতে এসেছি। জামাই হেসে ব্যাপারটা সহজ করে দিতে চায়।

—খপরদার, ওর মনে কষ্ট দিবা না। আবার নিকার কথা ভাবলে দু-টুকরো করে ফেলব। মেয়েরা চুপ করে থাকে বলে সাহস বাড়ছে—তাই না? দুসরী নিকা করলে আমার হাত থেকে তুমারে কেউ বাঁচাতে পারবে না। হাড়কাঁপানো আতঙ্ক জাগিয়ে দিয়ে যায় নসি।

যেদিন জারিনার মা কৃতজ্ঞচিত্তে জানিয়ে গেল যে জামাইয়ের চরিত্র বদলেছে, সেদিনই নাসবিবি ঝুড়ি তুলে নিল হাসিমুখে।

জালালসাহেব জানতে চাইলেন,

দিলদারসাহেব, নসিবিবি এ ঝুড়িটা পেতেছে কতদিন আগে?

—কিছুদিন আগে। কান্নামাখানো গলা দিলদার সাহেবের।

—এই না-জায়েজি কাজটা সে করেছে কার জন্যে? জানার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছিলেন মৌলভীসাহেব।

বড়ো নিরীহ মানুষ এই দিলদারসাহেব। কিন্তু কথাটা শোনা মাত্র আগুনের মতো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলেন তিনি। চিৎকার করে উঠলেন—জায়েজ, নাজায়েজ কাকে বলে জানেন? এই দুটি শব্দের সীমারেখা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকলে এ কথা কখনও মুখে আনতে পারতেন না। চুপ করুন।

জালাল সাহেবের চোখে বিস্ময়ের বিস্ময়- আপকা খুব গোসা হোয়া···

—আলফাল কথা বললে কার না গোসা হয়, মৌলভীসাহেব।—কিতাবের কথা, জীবনের কথা এক নয়। এ জীবনে বহু দেখলাম। মানুষের ভালোর জন্যে নিজেদের কিছু করার তো ক্ষমতাই নেই—কেউ কিছু করলে নিন্দুক হয়ে উঠি, সমালোচনা করি। নসিবিবির ঝুড়ির ওপর আপনার এত আক্রোশ কেন?

—ঝুড়িপূজা ইসলামশাস্ত্রবিরোধী।

—চুরি করা, মদ খাওয়া, লম্পট জীবন যাপন—সবই তো ইসলামশাস্ত্রবিরোধী। এই গাঁয়ের কয়জন মাতাল-চরিত্রহীনের কাছে গিয়েছেন হেদায়েত দিতে? ধর্মের বাণী শোনাতে?

—জরুর যাব। তার আগে ঝুড়িটাকে আমি শিউলিপুরের পানিতে ফেলতে চাই। বলুন তো, নসিবিবি এখন কোথায়?

—জেলখানায়।

—নসিবিবির জেল হল কেন?

—বলব না। উঠে দাঁড়ালেন দিলদার সাহেব, বেরিয়ে গেলেন মসজিদ থেকে।

নসিবিবির জীবনের শেষ ঘটনার বনিয়াদ ছিল ভিন্ন। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে নি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে শেষ পরিণতির কথা কখনও ভাবে নি।

সন্ধ্যায় ঘরেই ছিল নসিবিবি। ইয়াকুব তখনও বিড়ি বেঁধে ঘরে ফেরে নি। টুকিটাকি বিড়ির পাতা কাটছিল, কুলোটা কোলে তুলে। নফর মিঞার চাকরানি—শামীমের মা—ঘরে ঢুকল চোরের মতো। চুপটি করে বসে এদিক-ওদিক চাইল।

নফর মিঞার বিবি নেই। দুই ছেলে, তাদের বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরা সংসার। নফর খামারবাড়িতেই থাকেন, খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওইখানেই। শামীমের মা-ই এখন নফর মিঞার সব। তদারকির মধ্যমণি। এক কালের রক্ষিতা, কূটনৈতিক প্রয়োজনে

পেয়েছে। বয়স পাঁচের ঘরে। শক্ত-সমর্থ মেয়ে।

পাতা কাটতে-কাটতে নসিবিবি অবজ্ঞার দৃষ্টি ছড়াল। বলল, কী খবর, চাচি?

ফিসফিস করে সে বলল, নফর মিঞা অনাথ-আতুরদের একবস্তা ধান আর কুড়ি টাকা দান করছে। নিতে চাস তো বল।

খ্যাঁক করে উঠল নসিবিবি—কী বুললি, চাচি? আমি কি বিধবা? আমার কি ভাতার নাই? আমি কেনে পরের দান নিতে যাব বল।

—অনেক মেয়েই নিচ্ছে। তাই তুকে বলতে আসা। নফর মিঞা নিজেও বললেন—একবার নসিবিবিকে খপরটা দিস। তাই দিলাম। ইয়াকুব বিড়ি বেঁধে খায়। কয়টা টাকাই বা পায়? এতে জোয়ানি মেয়ের শখ সাধ আহ্লাদ কি মিটে?

সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। নিজেকে সংযত করে নসিবিবি বলল, দরকার হলে বলব। তুই এখন চলে যা।

কণ্ঠে তাপ ঝরায় শামীমের মা—কেনে লো, কুকুর-তাড়া করছিস!

পাতাকাটা বন্ধ রেখে শামীমের মায়ের চোখে চোখ রেখে বলল, আমি নিজেই যদি খেপে গিয়ে তুকে কামড়ে দি। খ্যাপা কুকুরের কামড়ে বিষ আছে, চাচি।

শামীমের মা পালিয়ে বাঁচল। ধুরন্ধর মেয়ে, বাইর-দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ মটকে বলল, দরকার হলে বলিস।

—আজ কেউ ধান আনতে গেছে, চাচি?

—লতিফা গেছে। ওর ভাতার তো ওকে দেখে না। বাপের ঘরে পড়েই আছে।

—লতিফা মেয়েটা তো বড়ো ভালো। সে ফাঁদে পা দিল কী করে। সে ছুঁড়ি ফিরুক। তার কাছে সব শুনি। তার পর যাব।

শামীমের মা বিদেয় হল। রাত্রি গাঢ় হয়ে এল। ইয়াকুব তখনও ফেরে নি। একটু পর লতিফা এল। বিনা ভূমিকায় নসিবিবির কোলে আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এ কান্না কেন—নসিবিবির জানা।

শক্ত গলায় বলল নসিবিবি, কী রে, ধান পেলি?

—হারামি আমার সব লুট করেছে।

—জানি। ভেবে পাই না তোরা যাস কেনে। কথা বলতে-বলতে পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল শরীর। বলল, ঘরে যা।

পরের দিন নসিবিবি শামীমের মায়ের ঘরে হাজির। শামীমের মা চমকে উঠল। ফিসফিস করে বলল, নসি, তুই?

—আমি ধান লিব, চাচি। খবর দে মিঞাকে।

—তোর ধান লিয়ে কাজ নাই, ঘরে ফিরে যা।

—ধান আমার চাই।

শামীমের মা অবাক। সে কোন্ মেয়ের সাথে কথা বলছে। এ তো মেয়ে নয়, ইস্পাতের একটা ফলা যেন।

—যাদের ধান দেওয়া হয়, তাদের সাথে কী আচরণ করে তা কি তুই জানিস নে?

—আমি কিছু জানতে চাই নে, ধান আমি লিব।

—চুপ কর হারামজাদি।

—এ গাঁয়ের সব গরিব মেয়েদের সর্বনাশ করিয়ে আবার উপদেশ দিচ্ছিস, চাচি।

—যা করি, পেটের দায়ে।

—মিথ্যা কথা, ব্যাবাক মিথ্যা কথা। তুই করিস স্বভাবে। তুই খপর দে।

নসিবিবি যখন বেরোচ্ছে, ইয়াকুব তখন ঢুকছে। নসির হাতে ঝুড়ি দেখেই চমকে ওঠে ইয়াকুব। নিশ্চয় কোনো অঘটন ঘটাতে যাচ্ছে। ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করে—কুথা যাবি?

—হাতি মারতে।

—হেঁয়ালি ছাড়, নসু—সত্যি কথা ক।

—আমার আর সময় নাই। এই ঝুড়ি চাপা দিয়ে বাইর হচ্ছি। ঘরে না ফেরা পর্যন্ত ঝুড়ি যেন চাপাই

থাকে।

নসিবিবি আসবে ধান নিতে স্ব-ইচ্ছায়। খুশিতে নফর মিঞার জিভে জল ঝরছে। বাহাদুরি আছে চাচির। সত্যি-সত্যিই সে আজ একটা তাজা জোয়ানিকে ধরে এনে দিয়েছে।

নসিকে দেখে হাসল নফর মিঞা। দেখে-দেখে আর আশ মেটে না। খুব নরম করে বলল—বস, নসু।

নসিবিবি কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। লড়াইয়ের ময়দান। লড়াই কোন্ দিক থেকে শুরু করবে—তারই একটা ছক নসিবিবি আঁকছিল মনে-মনে।

লোকটার পাকানো চেহারা। সামনের দুটো দাঁত নেই।

—হাঁরে, তোর বস্তা কই নসু? ধান নিবি নে?

মৃদু হাসি খেলে গেল নসির মুখে—শুধু ধান, আর কিছু লয়?

—পাবি, পাবি—সব পাবি। কাছে এসে বোস আগে।

হাত ধরে টানতে গেল নফর মিঞা। সরে গেল নসিবিবি।

—তোমার আল্লাতে বিশ্বাস নাই?

—তোর আছে?

—আছে। আল্লাতে বিশ্বাস না থাকলে দুষ্টু দমন হবে কী করে?

—কী সব হেঁয়ালি করিস, নসু। পয়সা আছে যার, ক্ষমতা আজ তারই। সে অত কেয়ার করে না। আল্লা থাকলে তোর মতো সুন্দরীর এমন দশা হয়? এমন বউয়ের কদর জানে ইয়াকুব? ভালো খেতে পরতে পারলে তোর গতরের কেমন চেকনাই হত, একবার ভেবে ছাখ।

একটু থেমে বলে, তোকে আমি কষ্ট পেতে দেব না। তোকে আমি গলার মালা করে রাখব—বলেই আবার নসির হাত ধরতে গেল নফর মিঞা।

নসিবিবির এবার রুদ্রমূর্তি। চাপাকণ্ঠে বলল, খপরদার গায়ে হাত দিবি না। আমি আজ ঝুড়ি চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি।

—ঘরে গিয়ে ঝুড়ি তুলে নিবি।

—তা হয় না। তোর মতো জানোয়ারকে খতম করব বলে এসেছি। বাড়ি যাব বলে আসি নি।

বাঘিনীর মতো নসিবিবি এগোতে থাকে। হাতে তার উদ্যত ইস্পাতের ফলা। চতুর্দিক শুনশান। খামারবাড়ির নির্জনতা ভেদ করে নফর মিঞার চিৎকার কারো কানে পৌঁছয় না।

নসিবিবি আর ঘরে ফেরে নি। ধরা দিয়েছিল। বিচারে ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় নি। ইজ্জত রক্ষার্থে খুন। তাই শাস্তি স্বল্প মেয়াদের।

—কোন্ দিন ছাড়া পাবে?

—জেলার সাহেব দিনটি জানিয়ে দেবেন—উকিল জানালেন।

ইয়াকুব সামনে দাঁড়াতেই নসিবিবি দৃঢ়ভাবে বলল, চোখের পানি মুছে ফেলো। ফিরে এসে আমি আবার সংসার করব। শয়তানটাকে তো খতম করতে পেরেছি।

কয়েক পা এগিয়ে পিছু ফিরে বলল—ওই ঝুড়িটা চাপা থাক। যদি পচে না যায়, আমি এসে তুলব। ঝুড়ি পচে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গাঁয়ের মেয়েরা নতুন ঝুড়ি চাপা দিয়ে নসিবিবির প্রতীক্ষায় রয়েছে।

রবীন্দ্র-গবেষণার একটি অভিনব ধারা

গৌরী আইয়ুব

মননশীল লেখিকা এবং নিরলস সমাজকর্মী গৌরী আইয়ুব এ যাবৎ যখনই কলম ধরেছেন তাঁর লেখার প্রতি সমাজ-সচেতন পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে অপ্রতিরোধ্য-ভাবে। কারণ, শুধু লেখার জন্য না লিখে তিনি কলম ধরেন সমাজ, সাহিত্য এবং মানুষের জন্য বিবেকের তাড়নায়, বিশেষ পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে। মৃদু অথচ স্পষ্টভাষণ তাঁর লেখা নিবন্ধগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনের বাঙলা বইটি বন্ধ করে ইংরিজি বইখানা খুলে খুব আরাম বোধ হয়েছিল। প্রথমত চোখে। নাভানারছাপাই ও কাগজ যেমন চোখের পক্ষে কষ্টকর, সাহিত্য একাডেমির প্রকাশনা তেমনি নয়নশোভন।

তারপর বইয়ের ভাষা। "রবীন্দ্রনাথ ও ভিক-তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" পড়তে-পড়তে একেক বার ধন্দ লাগছিল যে এ আমারই মাতৃভাষা পড়ছি তো! তাঁর বাকশৈলীর কিঞ্চিৎ নমুনা পেশ করি: 'আত্মার লঘিমা ঘটক উত্তেজনা…'; 'ভূ-স্কের অস্থির থালাগুলি…'; 'জননী মৃত্যু যে কতখানি প্রবল ছিল…'; 'একটি কি দুটি ব্যক্তি পাখী…'; 'কালিই যে তার শ্রেণী মিত্র…'; 'রোদ যা কিনা অনুমানাত্মক ঈশ্বরের হাসি-ভরা মুখ…'; 'কমলাকে নেহরু তুলিত করেছিলেন…'; 'আমার মন মুখের আপতিক কথাদের মাধ্যমে…'; 'নানা শ্রেণীর মূলক চিন্তকদের মধ্যে…'; ইত্যাদি। এগুলিকে কতখানি সিরিয়াসলি নেওয়া যায় ভেবে পাই নি। বয়ঃসন্ধি-কালে কিশোর-কিশোরীদের মুখে 'আত্মীয়তার চাষ' অথবা 'স্পৃষ্ট হলাম' শুনলে কৌতুক বোধ করা যায় বটে।

কিন্তু স্বচ্ছন্দপ্রবহমান অথচ গভীর অর্থবহ গদ্য যে ইনি লিখতে পারেন না তা নয়। প্রায়ই অসচেতন-ভাবে লিখে ফেলেন। তারই সঙ্গে আবার যখন কষ্টকৃত বাক্‌ভঙ্গি যুক্ত হয় তখন সেই বন্ধুর ভাষার উপর হোঁচট খেতে-খেতে প্রাণমন আর্ত হয়। মনে কাতর প্রশ্ন ওঠে: এই থামখেয়ালিপনার কি নিতান্তই প্রয়োজন ছিল?

ওদিকে *In Your Blossoming Flower Garden*-এ যেমন অনায়াস দক্ষতায় ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর মাতৃভাষায় নিজের বক্তব্যকে যুক্তিসহ এবং উপাদেয় করে তুলতে পেরেছেন কেতকী তা ঈর্ষণীয়। প্রায় পৌনে পাঁচশ পৃষ্ঠার তথ্য- ও ব্যাখ্যান-সম্বলিত বই-খানি যে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য

সংযোজন, একথাটা আমার অনেক আগেই বহু যোগ্যতর ব্যক্তি বলেছেন বলে অনুমান করি।

বইয়ের বিষয় রবীন্দ্রনাথ। বরং আরো সীমিত করে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি গভীর অভিজ্ঞতা—যার ঋজু কাব্যিক উল্লেখ প্রথম পাওয়া গিয়েছিল "পূরবী" কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়। "পূরবী"তে যতটুকু ধরা পড়েছিল তাতেই তাঁর ঘনিষ্ঠ জনেরা এবং পাঠকেরাও অনেকে কৌতূহলী হয়ে উঠে-ছিলেন আরও জানবার জন্য। তাই অনুসন্ধান থেমে থাকে নি। তাঁর অন্যান্য রচনায় এবং প্রধানত ছবিতেই সেই অভিজ্ঞতার 'তির্যক' উপস্থিতি আবিষ্কার করেছেন কেউ-কেউ। উদ্যমী গবেষক কেতকী কুশারী ডাইসন সেই পথেই আরো অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। ইতি-পূর্বে যা অজ্ঞাত ছিল এমন কিছু নিতান্ত ব্যক্তিগত—এবং কারো বা মনে হতেও পারে যে সর্বজনসমক্ষে অনুচ্চারণীয়—কিছু প্রসঙ্গও 'ফাঁস' করে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ-নামধারী পবিত্র 'দেবপ্রতিম' সত্তাটিও আসলে রক্তমাংসেরই মানুষ ছিলেন। কার সাধ্য অস্বীকার করে?

যাই হোক, রবীন্দ্রসাহিত্যের মনোযোগী পাঠকেরা ষাট-পঁয়ষট্টি বছর ধরেই "পূরবী" কাব্যের উদ্দিষ্টা বিজয়া ওরফে ভিকতোরিয়া ওকাম্পো সম্বন্ধে মৃদু এবং মধুর কৌতূহল পোষণ করে এসেছেন। কেতকীর আলোচ্য বিষয়টি একান্তই বাঙালি ঔৎসুক্যের ব্যাপার ছিল এতকাল। কিন্তু এই ইংরিজি বইখানির কল্যাণে সঙ্গতভাবেই ব্যাপারটা এতদিনে আন্তর্জাতিক কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠল। কিন্তু কবি ও কবি-কৃতির সঙ্গে যতখানি পরিচয় থাকলে এই ঘটনাটি, আর সুদীর্ঘ ও ঘটনাবহুল রবীন্দ্রজীবনের উপর এই ঘটনার প্রভাবকে, যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারবেন এবং তার ঠিকমতো মূল্যায়নও করতে পারবেন তেমন পরিচয় ইংরিজি বইয়ের বিশ্বব্যাপী পাঠকদের শতকরা দশজনেরও থাকা সম্ভব কিনা—এ প্রশ্ন করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।

অগত্যা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের বিধিমতো পরিচয় করিয়ে দেবার একটা দায় এই লেখিকার পক্ষে এড়ানো সম্ভব ছিল না। এই দায়িত্ব যদিও খুবই যোগ্যতার সঙ্গে তিনি পালন করেছেন, তবু মাত্র পনেরো পৃষ্ঠার পরিসরে বিদেশীদের জন্য টেলিস্কোপের উলটো দিক দিয়ে দেখা যে ছবি ধরে দেওয়া হয়েছে তা পড়তে-পড়তে একটা অদ্ভুত ধরনের অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এই একটি মানুষই যে আমাদের এত কিছু ছিলেন এই ব্যাপারটাই বিশ্বাসযোগ্য ঠেকবে কিনা বিদেশীদের কাছে সেই ভাবনাটা প্রায় দুর্ভাবনা হয়ে উঠেছিল আমার মনে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি এবং ১৫/১৬ কোটি মানুষের এই ভাষাটা নিতান্ত পিছিয়ে-থাকা ভাষা নয়। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ সংগীতকার। ভারতীয় চিত্রশিল্পে তিনিই আধুনিকতার পথিকৃৎ। এতটা হলেই কি যথেষ্টর বেশি হত না? তিনিই যে আবার শিক্ষা নিয়ে সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং একটি অভিনব আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা তিনি, সেই তথ্যটাও তুচ্ছ নয়। সেই সূত্রে একথাও বলতে হয় যে তাঁর দেশ যখন জাতীয়তা-বাদের আবেগে উদ্বেল তখনই স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবনাকে রূপ দিয়েছিলেন এই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অবলম্বন করেই। আবার গ্রামীণ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত তাঁর এই বিশ্বভারতীর মাধ্যমেই পল্লী-সংগঠন-উন্নয়নের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন হাতে-কলমে। এই রবীন্দ্রনাথই যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য 'মরুবিজয়ের কেতন' উড়িয়েছিলেন ৬০ বছর আগে সে খবর আজকের সবুজ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কজন রাখেন জানি না। এদেশে আরো যে কতকিছুর পথিকৃৎ তিনি তার তালিকা যত দীর্ঘ করা হবে ততই কি ক্লান্তি এবং অবিশ্বাসের রেখা গভীরতর হবে না সদ্য-পরিচিত পাঠকের মুখে? বিশেষ করে এই প্রতিবেদন যদি পেশ করি তাঁর কোনো বাক্‌সর্বস্ব স্বভাষী, তাহলে তো বিদেশীর মনে এমনতর

আশঙ্কা হতেই পারে যে বীরপূজার উচ্ছ্বাসে পরিমিতি-বোধকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ঐ-দেশী পাঠকের উপকারার্থে একটি উপাদেয় তুলনা দিয়েছেন লেখিকা—'To use western categories he is a poet in his own right; but if he appears to be, for his people, a Shakespeare and Schubert and a Bob Dyllan rolled into one, that is by virtue of the time and place and tradition in which he was born, which made such an evolution possible.' এরই সঙ্গে আবার একটি ভ্যান গগকেও যদি রোল করা হত তাহলে অবিশ্বাসের ভ্রূ-কুঞ্চন আরো কত গভীর হত তাই ভাবছি।

নিজেরই হাতে পাতা এত সুবিস্তৃত জালে যিনি এমন করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তিনিই যে আবার মাঝে-মাঝেই তার বাঁধন কেটে বেরিয়ে পড়তে পারতেন 'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো' এটাও একটা বিস্ময়। এলমহার্স্ট সহৃদয়তার সঙ্গে লিখে-ছিলেন, 'All through his life the introspective artist-mystic in Tagore had to try and make peace with the crusading philosopher-humanist. The one longed for the peace and leisure in which to dream and, surrounded by the beauties of nature, to create in song, music, colour, poetry or drama, and the other to be off on one worthy mission after another to the ends of the earth.' তাঁর স্বদেশবাসীরা কয়েক জন বেশ কিছুকাল ধরে বলে চলেছেন যে নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকেই নাকি তাঁকে গুরুগিরির নেশায় পেয়েছিল। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার বাণী পশ্চিমের বস্তুবাদী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার একটি স্বনির্বাচিত ভূমিকা গ্রহণ করে ফেলেছিলেন বলেই তাঁর এত ঘন-ঘন বিদেশ-যাত্রা। ব্যাপারটা যে মেকি সেকথা বলতেও কেউ-কেউ ছাড়েন নি। হবেও বা। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে, জীর্ণ দেহেও যে তাঁর 'মনোবৃক্ষের পাতাগুলি রসলোলুপ ছিল', একটা কিশোরসুলভ ঔৎসুক্য যে কোনো দিনই তাঁকে ছেড়ে যায় নি, এটুকু দাবি করলে কি তাঁর প্রতি খুব বেশি পক্ষপাতিত্ব করা হয়ে যায়?

তবে সদ্য চীন থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেই যখন তেষট্টি বছরের বৃদ্ধটি আবার পেরুর দিকে পা বাড়িয়েছিলেন তখন দক্ষিণ গোলার্ধের প্রতি কৌতূহলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশ্বভারতীর সদাশূন্য অর্থভাণ্ডারে কিছু প্রাপ্তির আশা। পেরুর সরকার তাঁদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই বিশিষ্ট অতিথিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরতি পথে মেক্সিকো যাবার প্রস্তাবেও তিনি সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরু কি মেক্সিকো কোথাও আর পৌঁছাতেই পারলেন না। সেসব বাতিল করে অসুস্থ দেহে আর্জেনটিনায় থেকে যেতে হয়েছিল চিকিৎসা আর বিশ্রামের জন্য। অথচ সেখানে থাকার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। তবে রাজধানী বুয়েনোস এয়ারিসের উপর দিয়ে যাবার সময় তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন সেখানেও বেশ ফলাও করেই করা হয়েছিল।

এই উপলক্ষে *La Nacion* পত্রিকায় এক মহিলা একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার শিরোনাম ছিল : "রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের আনন্দ"। রচনাটির উপসংহার ছিল এইরকম : 'Bimala (the heroine of 'The Home and the World') used to wake up silently at dawn to take the dust of Nikhil's feet. She felt the need for this humble gesture. That act, which amongst her people constitutes the symbol of true respect, was necessary for her.

Bimala's gesture is the only word I can find with which to express myself, and it is with such proof of respect that I salute Rabindranath Tagore.'—এই লেখিকা ভিকতোরিয়া ওকাম্পো তখনও রবীন্দ্র-নাথকে চোখে দেখেন নি। কিন্তু আন্দ্রে জিদ-এর অনূদিত ফরাসি গীতাঞ্জলি আরো দশ বছর আগেই পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন, তা ছাড়াও *Sadhana, The Home and the World, The Gardener, Chitra* ইত্যাদিও ক্রমে তিনি পড়ে নিয়েছিলেন। কেতকীর বইয়ে *La Nacion* পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত এই অংশটুকু পড়ে কোন না বাঙালির দেহ রোমাঞ্চিত হবে? দুই পক্ষেরই কী পরম সৌভাগ্য যে ঘটনাক্রমে এঁরই অতিথি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শতবর্ষ পরে তাঁর কাব্য কৌতূহলভরে যে পড়বে তার প্রতি করির কত আগ্রহ। লিখেছিলেন,

আজিকার কোনো রক্তরাগ
অনুরাগে সিক্ত করি পাবিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে—

কিন্তু সহস্র-সহস্র যোজন দূরে বসে যে-যুবতী তাঁর বই পড়েই দূর বাঙলাদেশের একটি দাম্পত্য-প্রথার তাৎপর্য এত দূর বুঝতে পেরেছিলেন এবং এমন চমৎকার তার প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন নিজের রচনায়, যিনি রবীন্দ্রনাথকে আতিথ্য দিতে পেরে ধন্য মনে করেছিলেন নিজেকে, তাঁকে জানতে রবীন্দ্রনাথ কত-খানি আগ্রহ বোধ করেছিলেন? অথবা জানতে চেষ্টা করেছিলেন? এমনকী জানতে কৌতূহল হয় যে তাঁর ঐ স্প্যানিশ নিবন্ধটি কেউ কি তাঁকে অনুবাদ করে শুনিয়েছিল, যখন তিনি তাঁরই গৃহে অতিথি ছিলেন?

আত্মরত কবি লিখেছিলেন বটে,

তেমনি তাবার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, তোমারে যে জানি আমি জানি—

কিন্তু সেই কল্যাণীর ব্যক্তিস্বরূপকে তিনি কতটুকু জানতে চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে আমাদের কৌতূহল হয় বই কি। বিশেষত সেই অভিমানিনী নারী যখন নিজেই লিখেছিলেন: 'You will never know *how* I have read your books, Gurudev, and you even don't care a *jam* to know. I feel it strongly.' শুধু যে তাঁকেই জানবার আগ্রহ দেখান নি রবীন্দ্রনাথ তাই নয়, এমনকী ভিকতোরিয়া যে রবীন্দ্ররচনা কতখানি পড়েছেন এবং বুঝেছেন সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নি—এটাই ছিল তাঁর আরো বড়ো বেদনার কারণ। অন্যত্র তিনি লিখেছিলেন, 'Rabi Babu can say or write nothing that is not already living its obscure life at the roots of my being. That is why he can't escape *me*, no matter how ignorant of *me* he is.'

ভিকতোরিয়ার এই 'তুমি মোর পাও নাই পরিচয়' অভিমানের মূলে কী ছিল? কেতকীর আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই মহিলাও তাঁর অভিজাত্যে জানতেন যে 'কৃতী পুরুষেরা মেয়েদের কাছ থেকে প্রধানত প্রত্যাশা করেন প্রেরণাদাত্রীর ভূমিকা, সমানে-সমানে সৌহার্দ্য আর দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নয়।' অবশ্য কেতকী একথাও বলেছেন যে অন্যদের প্রতিতুলনায় 'রবীন্দ্রনাথই আজীবন ভিকতোরিয়াকে পৃষ্ঠপোষকত্ব -বর্জিত আন্তরিক সৌহার্দ্য উপহার দিতে পেরেছিলেন।' নারীপুরুষের সহজ বন্ধুত্বের পথে আর-একটা বড়ো বাধাও মাঝে-মাঝে দেখা দেয়। যে-নারীর ব্যক্তিত্বে কোনো পুরুষ আকৃষ্ট হন তিনি যদি প্রেমিকা হতেও আগ্রহী না হন তাহলে অনেক সময়ই পুরুষটি প্রত্যাখ্যাত বোধ করে আহত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ভিকতোরিয়ার সে-জাতীয় অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা বারকয়েক ঘটেছিল—একবার কাউনট কাইজারলিঙ-এর সঙ্গেও। তবে 'রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যটা এই যে রবীন্দ্রনাথের বিবেচক সংযমের ফলে সম্পর্কটা

কোনো পর্যায়েই ঝটিকাক্ষুব্ধ বা বিপর্যস্ত হয়ে যায় নি।' জেনে আশ্বস্ত বোধ করি।

তবু কেন এই দুই ব্যক্তির সম্পর্কটা এমন ছাড়া-ছাড়া রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত?

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কি মোর আছে দিতে।—

এমনতর আশঙ্কা তো আসতেই পারে বৃদ্ধ কবির। তা ছাড়া আরো যেসব প্রতিরোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের ভিতরেই তাও তন্ন-তন্ন করে বিশ্লেষণ করেছেন কেতকী। অন্য দুজনেরও স্বভাবের এবং জীবনের যে কোনো বাধা ছিল না কোথাও তাও তো নয়।

এই ত্রয়ী সম্পর্ক গোড়া থেকেই কেমন জটিল রূপ ধরেছিল তার দিনানুদৈনিক বিবরণ আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অতিথি সেই সময়েই ভিকতোরিয়া *Red Oleanders* পড়েন। "রক্তকরবী" রূপক নাটকে যে তিনজন মানুষের বাস্তব সম্পর্কের ছায়া পড়েছে বলে পুরানো জল্পনা শুনেছি তাঁদের শনাক্তকরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিবর্তন-বিশ্লেষণ লেখিকা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন বটে। তবে সবটুকু পড়ে আমার অ-সাহিত্যিক কৌতূহল চরিতার্থ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু "রক্তকরবী" নাটকটিকে আগে যেমন বুঝেছিলাম সেই বোঝা আর-একটু গভীরতর হল কি? কিংবা তাতে কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত হল কি? হতে পারে অন্য কোনো পাঠকের বেলায় হয়েছে। কিন্তু আমার সাহিত্যিক অনুভব কোনো দিক থেকে যে সমৃদ্ধতর হয়েছে—এমনটা মনে হল না।

এবার আর্জেনটিনার জীবনরঙ্গমঞ্চে *Red Oleanders*-এর সমান্তরাল একটি ঘটনা ঘটে উঠছিল বলে লেখিকার আলোচনা থেকে জানা গেল। পুরুষ দুজন সেই "রক্তকরবী"-কাহিনীর দুটি পুরুষই: কবি এবং তাঁর সচিব ও ভ্রমণসহচর—'রাজা' ও 'রঞ্জন'। তবে নারীটি সম্পূর্ণ অন্য একজন—অর্থাৎ ভিকতোরিয়া ওকাম্পো এবার 'নন্দিনী'। রক্তকরবীর বেলায় জীবনের ছায়া পড়েছিল নাটকে, এবার নাটকের অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা গেল জীবনে—অবশ্য এক্ষেত্রে দুইয়ের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ-সম্পর্ক নেই। এই গবেষণাকে অলস কল্পনা বলব না মোটেই, বরং বেশ সযত্ন-বিন্যস্ত কল্পনা এটি। এবং প্রাসঙ্গিক যে ব্যাখ্যান পাওয়া গেল সেটিও উপাদেয়। গোড়া থেকেই সম্পর্কটা যে একটা বেদনাদায়ক আবর্তে পড়ে গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং ভুলবোঝাবুঝি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল তা জানা গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বুয়েনোস এয়ারিস ছেড়ে চলে আসার আগেই যে তিনজনের সৌহার্দ্য অনেকটা সহজ স্বাভাবিক রূপ পেয়েছিল একথাও ঠিক।

ভিকতোরিয়ার এতখানি প্রাথমিক আগ্রহ এবং সে কারণেই রবীন্দ্রনাথেরও নানা প্রত্যাশা ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও তাঁদের দ্বিতীয় এবং শেষবার দেখা হবার আগে কেন যে প্রায় ছয়-ছয়টি মহামূল্যবান বৎসর বৃথা কেটে গেল তার আসল কারণ ভিকতোরিয়ার জীবনের জটিলতাতেই নিহিত ছিল মনে হয় এবং এখনও তা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় নি—কখনও হবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু ১৯৩০ সালে প্যারিসে যে 'ফিরে দেখা' সেও তো এক আশ্চর্য আতসবাজির মতো জ্বলে উঠেই নিভে যাওয়া।

তবে তার পরেও যা পড়ে রইল তা মোটেই 'শুধু ধূলি শুধু ছাই' নয়। সম্পর্কটা দিকিদিকি করে জ্বলছিল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত। তাছাড়া দুজনের ভাণ্ডারেই কিছু অক্ষয় ধন যে জমা পড়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। সে বিষয়ে অনেকেই যে কৌতূহলবোধ করেছিল সেটাও স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ নিজে থেকেই বলেছিলেন,

আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।

কিন্তু তিনি যতটুকু খুঁজে দিতে রাজি ছিলেন ততটুকুতেই আমাদের ক্ষুধা মিটবে, এমন কি কথা আছে? এবং 'জাগায়ে রাখিবে চিরদিন/সকরুণ তাহারি বারতা'—এই স্বীকারোক্তির পরেও সন্ধান চলতেই থাকে। ১৯২৪-পরবর্তী কালে কবির সৃজনকর্মের পিছনে ভিকতোরিয়াই যে প্রধান প্রেরণাদাত্রী, Muse, তা নির্বিবাদে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু নাকি নিরঙ্কুশ প্রমাণের সন্ধান করছিলেন কেতকী।

প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে দু পক্ষের ভালোবাসাকেই চুল চিরে বিচার করা হয়েছে। আদৌ 'ভালোবাসা' বা 'love' শব্দটি ওঁদের পক্ষে প্রযোজ্য কিনা, হলেও বা কতখানি প্রযোজ্য, তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। কোন্ পক্ষের ভালোবাসায় কতখানি আধ্যাত্মিক আকুলতা আর কতখানি দেহজ আকর্ষণ ছিল তারও নিক্তিমাপা বিশদ বিচার করেছেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে দৈহিক আকর্ষণের সুনিশ্চিত যে প্রমাণ 'আবিষ্কার' করেছিলেন বুয়েনোস এয়ারিসে গিয়ে ভিকতোরিয়ার কাগজপত্র ঘেঁটে, সেটিই সোৎসাহে পেশ করেছেন। সেই ঘটনাটুকুর বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে তাঁর আত্মজীবনীর ফরাসি খসড়ায়। পেয়ে লেখিকার মনে হয়েছে, 'It was evidently her hope that one day the detail would be retrieved by a researcher and given due value'! বিধিনির্দিষ্ট এই দায়িত্বে নিজেকে দেখতে পেয়ে কেতকী পরম সন্তোষের সঙ্গে জানান যে রবীন্দ্রনাথের ওই মৃদু সন্তর্পণ স্পর্শটুকু ভিকতোরিয়া প্রত্যাখ্যান তো করেনই নি, বরং 'motherly tenderness'-এর বশে বৃদ্ধের ভুল ভাঙাবার কোনো চেষ্টাও করেন নি। 'It was this connivance in the game, no matter how spiritual her own sentiments, that enabled her to become his Muse.'!

এই ব্যাখ্যায় হতবাক বোধ করেছি। ওই অভিজ্ঞতাকে নিজের অনুকূলে ব্যাখ্যা করে নিয়েই নাকি 'Tagore really did think that he had received a woman's love from Victoria Ocampo'। আরো বিশদ করে বলা হয়েছে যে 'without his perception of the presence of an erotic element in the relationship' রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতেন না। কিংবা বলা যায়, কেতকীই নিশ্চিন্তবোধ করতেন না। এবং 'She could become a Muse for him only because he thought it was the real thing'। রবীন্দ্রনাথ কি এতই স্থূলবোধসম্পন্ন ছিলেন যে ভিকতোরিয়ার ওই নিষ্ক্রিয় 'সহযোগিতা'-টুকুর ফলেই এতখানি আশ্বাস পেয়ে গেলেন? ওদিকে তাঁর বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করবার দুদিন পরেই তো আবেগ-উচ্ছ্বসিতা ভিকতোরিয়ার কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—'This can be had only from a woman's love and I have been hoping for a long time that I do deserve it.

'I feel today that the precious gift has come to me from you'. কেতকী যাকে 'real thing' মনে করছেন, এই 'precious gift' কি তাহলে সেই 'real thing' নয়? কিন্তু ওই অল্প কালের মধ্যেই পূর্বোক্ত ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে হয় না।

ওই যাকে রবীন্দ্রনাথের 'erotic overture' বলেছেন কেতকী, তার কোনো সুযোগ যদি নাই মিলত, কিংবা ব্যাপারটা ঘটে থাকলেও তার কোনো প্রমাণ ভিকতোরিয়া এভাবে রেখে না যেতেন, অথচ অন্য যা চিঠিপত্র স্মৃতিচারণ তা সবই যেমনকার তেমনি পেতাম আমরা, তাহলে তা থেকেও কি বলা অসঙ্গত হত যে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক

ঘটেছিল? তাঁদের পারস্পরিক আকর্ষণের তীব্রতা অনুভব করার জন্য ওই সাক্ষ্য-প্রমাণই কি যথেষ্ট ছিল না? বাইরের ও ভিতরের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই সম্পর্কের পূর্ণ বিকাশ যদি নাই ঘটে থাকে তবু যতটুকু ঘটেছিল তার দূরপ্রসারী ছায়া কোনো পক্ষই এড়াতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ তো নয়ই।

মোর ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে

তা সত্ত্বেও ভিকতোরিয়াকে তাঁর Muse বলা সঙ্গত হত না? ওই 'erotic element'-এর 'চাক্ষুষ'প্রমাণ কি এতই অপরিহার্য ছিল?

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করে বুঝবার পক্ষে যে ঘটনাটিকে অনুধাবন করা কেতকী প্রায় অপরিহার্য মনে করেছেন এবং এই সোনার চাবি আচমকা হাতে পেয়ে গিয়ে উল্লসিত হয়েছেন, তাঁর বইয়ে সেই ঘটনার বর্ণনা—ভিকতোরিয়ার জবানিতে হলেও—অত্যন্তই মর্মাহত করেছে অনেককে। সেটা বোধহয় লেখিকার কাছেও অপ্রত্যাশিত ঠেকে নি। কেন তাঁরা মর্মাহত হয়েছেন তাও তাঁর অজানা নয়। কোনো মানুষই যে মানুষী দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন একথা আমরা জানি বটে, তবু যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, তাঁর কোনো-কোনো মানুষী দুর্বলতার কথা—বিশেষত তা যদি অন্য কারুর কোনো ক্ষতি করে না থাকে—তাহলে তার প্রকাশ্য আলোচনা করতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি। অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বলি, 'থাক, ও তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার—ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।' এই কুণ্ঠা যৌক্তিক না অযৌক্তিক, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তা ছাড়া কোনো সত্যই অরুচিকর নয়, অনাবৃত সত্যকে জানলে কারুর ক্ষতি হয় না বরং জানতে না-চাওয়ার মধ্যে অপরিণত বয়সের দুর্বলচিত্ততা আছে এমন সব কথাও নিয়তই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রেমেই হোক বা ভক্তিতেই হোক, যে-রোম্যানটিকতা আছে, শুধু যা মনোরম তাই দেখার ঝোঁক আছে—এটাও কি নিতান্তই তাচ্ছিল্য করবার বস্তু? এর কি কোনোই প্রয়োজন নেই জীবনে? সব মোহমুক্তির পর যা অবশিষ্ট থাকে সেই 'সত্যামৃত' কি সব তৃষ্ণা মেটায়?

আরও একটা কথাও মনে হয়। আমার প্রিয় বা শ্রদ্ধেয় জন সম্বন্ধে কোনো সত্য কথা, যা অপরকে জানাতে তাঁর নিজের প্রবল আপত্তি হত বলে আমি নিশ্চিত জানি, সেকথা সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করার নৈতিক অধিকার কি আমার আছে? বিশেষ করে যে ঘটনা না জানলে কারুর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই? একটি ঘটনা মনে পড়ছে।

আমি এক অশীতিপর অকৃতদার, অসুস্থ মানুষকে মাঝে-মাঝে দেখতে যেতাম। এককালে তিনি বিদগ্ধ সমাজে খুবই আদৃত ব্যক্তি ছিলেন। সকাল এগারোটা নাগাদ তাঁর কাছে গিয়ে মাঝে-মাঝেই তাঁকে তপ্তাচ্ছন্ন পেতাম। একদিন গিয়ে ভেজানো দরজার পাল্লা একটু ঠেলে ঢুকতে গিয়েই ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তাঁর তক্তপোশের বিছানায় মাথা ঠেকিয়ে দীর্ঘকায় মানুষটি শরীর দুমড়ে একটা চটা-ওঠা কলাইকরা piss-pot-এর উপর বহুকষ্টে বসেছিলেন। কোষ্ঠ-কাঠিন্যে এবং অর্শে কষ্ট পেতেন বলে শুনেছিলাম। তাঁকে ওইভাবে সেকেনডের ভগ্নাংশ কাল দেখার অভিজ্ঞতা, মানুষের অসহায়তম কোনো অবস্থার ছবি চিরকালের জন্য আমার মনে এঁকে দিয়েছে। আমি সরে এসেই প্রথমে বালক ভৃত্যটির খোঁজ করলাম যার জিম্মায় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে রেখে দিয়েছিলেন। বিবেচনাহীন বালক পাল্লা দুটি আড় করে রেখে বেশ খানিকটা সময় অবসর পাওয়া গেল ভেবে হয়তো পাড়া বেড়াতে চলে গিয়েছিল।

আজও পরিচিত জনদের কাছে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গেলে ঘটনাটি উল্লেখ করতে পারি না শুধু এইজন্য যে আমি তাঁকে ওইভাবে দেখে ফেলেছিলাম একথা জানতে পারলে তিনি লজ্জায় মরে যেতেন। আর তাঁর নাম করে এই বর্ণনা কারুর কাছে করেছি

জানলে···না:, ভাবা যায় না।

আমরা কখনও কখনও কি আমাদের জিভ এবং কলমকে শুধু এই জন্যই সংযত করি না যে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার যিনি পাত্র তাঁকে যা ব্যথা দিতে পারত কিছুতেই তা বলতে ইচ্ছা করে না। অবশ্য এই ইচ্ছা না করাটাও (বিশেষ করে তিনি যখন বেঁচেই নেই) নিতান্তই অপরিণতবয়স্কের মনঃপ্রতিন্যাস হতে পারে; নির্মম সত্য সন্ধানের জন্য যে দুঃসাহসের প্রয়োজন হয় তার অভাব বলেও মনে হতে পারে। হোক, তবু আমি নিরুপায়। কোন্‌টা divine quest আর কোন্‌টা unholy curiosity—নিজের মতন করে তার তফাত না করেও পারি না—যদিও জানি প্রাপ্তবয়স্ক সত্যসন্ধানীদের তা আর করতে নেই।

রবীন্দ্রনাথের ভাবরূপ ম্লান হবার আশঙ্কাও কেউ-কেউ প্রকাশ করেছেন শুনেছি। এই আশঙ্কাটাই সবচেয়ে ছেলেমানুষি। অসামান্য গুণবান-রূপবান এবং অসময়ে মৃতদার এই মানুষটি জীবনের ৬৫ বৎসর ধরে যে পরিমাণ অসূয়ার শিকার হয়েছেন, তার তুলনা সহজে পাওয়া যায় না। শুধু তিনি নন, তাঁর শান্তি-নিকেতনও বাঙালির বহু অসুস্থ কল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশ সমাজপতি থেকে শুরু করে সজনীকান্ত দাস, রামাশ্যামাযদু—কত জনই তো কালি ছিটিয়েছেন তাঁর গায়ে! সত্তর পার হবার পরেও কোনো এক কাগজ লিখল রবীন্দ্রনাথ venereal disease-এ ভুগছেন! অত ছেনির ঘায়েও যদি তাঁর ভাবমূর্তি বিকৃত না হয়ে থাকে, তাহলে জনৈকা উত্তরসূরীর সামান্য একটু সত্যভাষণে কী এমন সর্বনাশ হতে পারে রবীন্দ্রনাথের? আর সেই 'সর্বনাশ' ঠেকাবার দায়ও আমার মতো ছোটো মাপের মানুষের উপর বর্তায় নি।

আমার দুর্ভাবনা অন্যত্র। শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত কি রবীন্দ্রসাহিত্য নয়, এমনকী তাঁর সবথানি কীর্তির চেয়েও যে রবীন্দ্রনাথ নামে মানুষটা অনেক বড়ো আশ্রয় দিতে পারে এই ছন্নছাড়া যুগকে, তাঁকে খুঁজতে বার হয়ে সে কথাটাই যেন ভুলে না যাই।

বাঙলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্বে চণ্ডীমণ্ডপ

অরবিন্দ সামন্ত

দুই : চণ্ডীমণ্ডপের অবলুপ্তি : আধুনিক যুগে চণ্ডীমণ্ডপ

চৈতন্যধর্মের মধ্যে একটি লৌকিক আবেদন ছিল। তাই বাঙলার সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্তাভজা, নাথ সম্প্রদায় এর মধ্যে নিজেদের আদর্শের সন্ধান পেয়ে একে অবলম্বন করেই পুষ্টিলাভের প্রতিজ্ঞা করেছিল। চৈতন্যধর্মে এই লৌকিক উপকরণের প্রাণশক্তি প্রবল ছিল বলেই মুসলমান শাসনের মধ্যেও তা বেঁচেছিল। কিন্তু মুসলমান শাসনের শেষে বাঙলা এক নতুন সংকটের মুখোমুখি হল। এই সংকটটি প্রত্যক্ষত সামরিক চরিত্রের। কিন্তু এর মধ্যে নিহিত ছিল বৃহত্তর অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংকট। আলিবর্দীর শাসনকালে (১৭৪০-১৭৫৬) বাঙলায় বর্গির হাঙ্গামা বা মারাঠা আক্রমণ হয়েছিল (১৭৪২-৫১)। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রাজমহল থেকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড মারাঠাদের অধীনে চলে যায়। এই অঞ্চলে মারাঠারা অকথ্য অত্যাচার চালায়। বিশেষত, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের জনজীবন বর্গিদের ব্যাপক লুণ্ঠনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সে লুণ্ঠন শিশুরও আতঙ্ক; তাই বাঙলায় বহু লোককথায় ছেলে-ঘুমানো আর পাড়া-জুড়ানোর সঙ্গে বর্গি আসার দুঃসংবাদটুকু দুঃস্বপ্নের মতোই প্রচলিত হয়ে গেছে। বাঙলার শিল্প-বাণিজ্য কিছুদিনের জন্য লোপ পেল। লোকেরা ধন, প্রাণ, মান রক্ষার জন্য দলে-দলে ভাগীরথীর পূর্বদিকে পালাতে লাগল। বাঙলার লৌকিক সমাজ-সংগঠন, চণ্ডীমণ্ডপীয় লোকজীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল।

বর্গির আক্রমণ বাঙলার পশ্চিমে আর মধ্যাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্বের আর উত্তরাঞ্চলের স্বাভাবিক কাজকর্ম আর জীবনযাত্রা ততটা ব্যাহত হয় নি। কিন্তু এই আংশিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠতে না উঠতেই বাঙলা আবার নতুন আর্থ-সামাজিক সংকটের সম্মুখীন হল। এই সার্বিক, ব্যাপক বিপর্যয়ের সূচনা হল ইংরেজদের বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের সঙ্গে-সঙ্গে। দেওয়ানি লাভ করে ক্লাইভ বাঙলায় যে শাসনব্যবস্থা চালু করলেন, তার নাম দ্বৈত শাসন। এই ব্যবস্থায় নবাবকে দেওয়া হল দায়িত্ব আর কোম্পানি নিল ক্ষমতা। কোম্পানির ক্ষমতা রইল বাঙলার রাজস্ব আদায়ের নামে অমানবিক শোষণ করার—সে শোষণ এতই দুর্বিষহ যে চাষিরা গ্রামগঞ্জ ছেড়ে বনেজঙ্গলে পালিয়ে গেল। আর দায়িত্বের নামে নবাবকে বলা হল এইসব ভীত পলাতকদের ধরে এনে আবার চাষবাসে জুতে দিতে। বাঙলা ক্লাইভের কাছে ছিল সোনার খনি; এই সোনার খনি থেকে নবাব ১৭৬৪-৬৫ সালে রাজস্ব তুলেছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। আর ঠিক এক বছর পরে ১৭৬৫-৬৬ সালে দেওয়ানি পেয়ে ক্লাইভ আদায় করল প্রায় দ্বিগুণ—২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এই ব্যাপক লুণ্ঠনে মানুষের জীবন হয়ে উঠল প্রাণান্তকর। 'বাঙলায় নেমে এল খাদ্যসংকটের অভিশাপ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

মেগাস্থিনিস তাঁর ভারতভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেছিলেন এদেশে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না। কথাটি কতদূর সত্যি তা আমরা নিশ্চিত করে জানি না। তবে নিশ্চিত জানি, দুর্ভিক্ষ তখনও পর্যন্ত মহামারীর আকার নেয় নি। তুর্ক-আফগান কিংবা মুঘল আমলে দুর্ভিক্ষ

ঘটেছে। কিন্তু সংবাদ পাওয়া মাত্রই সরকার তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। আকবর বোখরার শেখ ফরিদকে ত্রাণের দায়িত্ব দিয়েছেন। শাজাহান প্রয়োজনে লঙ্গরখানা খুলেছেন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, দুর্ভিক্ষে মুঘল সম্রাটরা প্রজাদের রাজস্ব মকুব করতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু ইংরেজ আমলে ছবিটা পুরোপুরি বদলে গেল। কোম্পানি দুর্ভিক্ষের বছরেও রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখে নি। মকুবের কোনো প্রশ্নই ছিল না। বরং ১৭৭১ সালে নীট রাজস্ব আদায় ১৭৬৮ সালের চেয়ে বেশিই ছিল।

মুঘল আমলে কৃষক ছিল জমির মালিক। রাজস্ব বকেয়া পড়লেও চাষিকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যেত না। বরং আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে, মুঘল আমলে জমি থেকে উৎখাত করার চেয়ে কৃষককে জমিতে বেঁধে রাখাই ছিল শাসকশ্রেণীর উদ্দেশ্য।[৩২] জমিতে কৃষকের দখলি স্বত্ব ছিল চিরস্থায়ী এবং বাংশানুক্রমিক। কিন্তু ক্লাইভ ভূমি-রাজস্বব্যবস্থাকে মুনাফা লাভের হাতিয়ারে পরিণত করলেন। দেওয়ানি লাভের পর রাজস্ব আদায়ের জন্য শুরু হল নানা কায়দায় এক ধরনের সাঁড়াশি অভিযান। ইংরেজ শাসনের আগে পর্যন্ত বাঙলায় রাজস্ব আদায় করা হত গ্রামসমাজের কাছ থেকে, কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নয়। তার ফলে গ্রাম-সভা বা চণ্ডীমণ্ডপীয় কাঠামোই গুরুত্ব পেত। এই সর্বজনীন সংগঠনই রাজস্বসংগ্রহের মাধ্যমে জন-জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারত। কোম্পানি চণ্ডীমণ্ডপের এই দায়িত্ব আর গুরুত্ব নস্যাৎ করে দিল—রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে গ্রামসমাজকে এড়িয়ে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা চালু করল। এর সুবিধে হল এই যে কৃষকেরা যখন সমবেতভাবে খাজনা দিত, তখন খাজনা দিতে অস্বীকার করাটাও সমবেতভাবে ঘটতে পারত। অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপীয় গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিরোধের ব্যাপারটাও প্রবল থাকত। কিন্তু এখন থেকে খাজনা দিতে হবে ব্যক্তিগতভাবে। ব্যক্তি একক দুর্বল, তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আরও দুর্বল। এক কথায়, চণ্ডীমণ্ডপীয় প্রতিরোধের নটেগাছটি সমূলে মুড়িয়ে দেওয়া হল; ক্ষমতার ভরকেন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপকে স্রেফ ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে দেওয়া হল।

আবার রাজস্ব দিতে হত পণ্যে নয়, মুদ্রায়। তাই রাজস্বের অর্থ জোগাড় করতে কৃষককে ফসল বিক্রি করতে হত। বাঙলার ফসল মানে তখন খাদ্য-ফসল—ধান, গম। সারা বছরের খাদ্যফসল সস্তায় কেনার জন্য কোম্পানির কর্মচারীরা ওত পেতে থাকত। তারা বাঙলার জায়গায়-জায়গায় চালের একচেটিয়া কেনাবেচার জন্য অসংখ্য ব্যবসাকেন্দ্র খুলে ফেলল। ব্যবসার অর্থ: বাধ্য-হয়ে-বিক্রি-করা চাষিদের মুখের গ্রাস কিনে নেওয়া। বিপুল লাভের লোভে এই মৃত্যু-ব্যবসায়ীরা এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠল।[৩৩] ফসল উঠলেই এরা সস্তায় চাষিদের কাছ থেকে ফসল কিনে নিত আর দাম বাড়লেই এরা তা চাষিদের কাছেই বিক্রি করত। আর এইভাবেই ভারতের শস্যভাণ্ডার বাঙলা একটি স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হল।

এর সঙ্গে যুক্ত হল কোম্পানির নিজস্ব সরকারি শোষণ। কোম্পানি মুঘল আমলের গোমস্তাদের জমির মালিক বলে ঘোষণা করল। যেখানে আগে গোমস্তা বা জমিদার ছিল না, সেখানে গ্রামসমাজের প্রধানকেই বলা হল জমির মালিক। এইভাবে চণ্ডী-মণ্ডপের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচিত প্রধানকে কোম্পানি ডিকটেটরের মর্যাদা দিল; চণ্ডীমণ্ডপের সমানাধিকার ধসে পড়ল। কারণ গোমস্তাদের বা পূর্বতন চণ্ডীমণ্ডপের প্রধানদের কাজই হল, এখন থেকে যত পার খাজনা আদায় করে, তার থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়া। সমানাধিকারে লয় গ্রামসভার সভাপতি এখন থেকে কোম্পানির শোষণের অন্যতম শরিক হয়ে উঠল। গ্রামজীবনের সংগঠনে, এই সামুদ্রিক পরিবর্তন, স্তরে-স্তরে বিস্তর বিভিন্নতায় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। বাঙলার

রাজস্ব আদায়ের সর্বময় কর্তা করা হল রেজা খাঁকে। রেজা খাঁ কোম্পানিকে তুষ্ট করতে নির্দিষ্ট রাজস্ব ছাড়াও নজরানা দিত আর এই নজরানার অর্থ সে আদায় করে নিত প্রজাদের উপর বাড়তি কর চাপিয়ে। রেজা খাঁর উৎপীড়ন এমন নির্লজ্জ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কোম্পানিই শেষ পর্যন্ত তাকে নিন্দে করতে বাধ্য হয়েছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙলার অর্থনীতিক কাঠামোকে সমূলে নাড়িয়ে দিয়েছিল। গ্রামসমাজের চণ্ডীমণ্ডপ কিংবা চণ্ডীমণ্ডপের গ্রামসমাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ক্লাইভ যে দেশকে বলেছিলেন সোনার খনি, সেই দেশে উনিশ বছর পরে এসে কর্নওয়ালিস বোর্ড অব ডাইরেকটরকে প্রথম চিঠিতেই লিখলেন : 'প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং জন্তু-জানোয়ার ছাড়া আর কেউ বাস করে না।' এই স্বর্ণখনিকে শ্মশানে পরিণত করার কৃতিত্ব অবশ্যই ক্লাইভ এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। বাঙলার এককোটি মানুষ স্রেফ না খেতে পেয়ে মারা গেল। জনশূন্য গ্রামবাঙলার গ্রামকেন্দ্রিক ব্যবসা লবণ, সুতিবস্ত্র, রেশম ভেঙে পড়ল। কৃষক, তাঁতি, মাঝি, কর্মকারদের মৃত্যু হওয়ার কৃষিকর্ম বন্ধ হবার উপক্রম হল।[৩৪] বহু পুরানো জমিদার মারা গেল। যারা বেঁচে রইল তাদেরও জীবনধারণই বিড়ম্বনা হয়ে পড়ল। বর্ধমানের রাজাকে সোনা-রুপোর তৈজসপত্র বিক্রি করে আর সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে হল।[৩৫] আবার দালালি, মহাজনি ব্যবসা করে হঠাৎ কিছু ধনী লোকও গজিয়ে উঠল। আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল—গড়ে উঠল লুটেরা দস্যুদল। দুর্ভিক্ষ সবচেয়ে আঘাত হানল সমাজজীবনের প্রচলিত কাঠামোয়। সামাজিক তথা পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা আর সহহতি একেবারে ভেঙে গেল। ভেঙে গেল মানবিক মূল্যবোধ। লোকে ঘর বেচল, বাড়ি বেচল, জমি বেচল, শেষে ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী। 'পতিপত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়া'—সমকালীন বিপর্যস্ত মানবিক সম্পর্কেরই স্থিরচিত্র। এ ছবির সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে উঠল চণ্ডীমণ্ডপের গণজীবনের বিপর্যয়। পুরনো সামন্ততন্ত্র, তা সে যতই নিন্দনীয় হোক, গ্রামজীবনকে সে বিধৃত করেছিল কয়েকটি ইতিবাচক মানবিক আধারে। অর্থ, সামর্থ্য আর অনুপ্রেরণায় সামন্ত-অভিজাতরা চণ্ডীমণ্ডপীয় জীবনের আর্থিক সমস্যাটির সুরাহা করেছিল। কিন্তু মন্বন্তরে বিপর্যস্ত সামন্তরাজাদের দাক্ষিণ্য চণ্ডীমণ্ডপ জীবনে লোপ পেল। এইভাবে ব্যক্তি আর ব্যষ্টিজীবনে চণ্ডীমণ্ডপ ধীরে-ধীরে লোকচক্ষুর বাইরে চলে যেতে লাগল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙলার অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণের জন্য, বিশেষ করে অনাবাদি জমি চাষে আনার জন্য এবং বাঙলার নতুন গজিয়ে-ওঠা ধনীদের জমিতে আকৃষ্ট করার জন্য, ইংরেজ সরকার নিয়ে এল আর-এক নতুন ভূমিব্যবস্থা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এর সুবিধে যারা নিল তাদের অধিকাংশই কলকাতার উচ্চবর্ণজাত ধনী সম্প্রদায়, যারা ইংরেজদের সহযোগী হয়ে বাণিজ্য চালায়, যারা বাণিজ্যের মুনাফার টাকা গ্রামে জমিদারি কিনে আরও মুনাফার জন্য খাটায়, সামাজিক মর্যাদা বাড়ায়। এই কমপ্রাডর শ্রেণী হল এখন থেকে গ্রামের কৃষিভূমি আর কৃষিজীবীদের ভাগ্যনিয়ন্তা, হর্তাকর্তা-বিধাতা। গ্রামে-গ্রামে তৈরি হল কাছারি বা খাজনা আদায়ের কার্যালয়। চণ্ডীমণ্ডপ নয়, এখন থেকে জমিদারি হল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, যে কেন্দ্রবিন্দুর শীর্ষে আছেন জমিদার, যে জমিদারের অধিষ্ঠান আবার প্রায়শই কলকাতা শহরে, বাঙলার নতুন রাজধানীতে।

জমিদারি কর্তৃত্বের সঙ্গে আবার যুক্ত হল ব্রাহ্মণ্য জাতিধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে গ্রামেগঞ্জে ব্রাহ্মণ-বসতি প্রতিষ্ঠিত হল জমিদারের দাক্ষিণ্যে। পালরাজত্বে এবং সেনদের বল্লাল বালাইয়ে একদিন যাদের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী মুসলমান রাজত্বে যারা ব্যাহত হয়ে

ছিল, তারাই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ যুগ "পল্লীসমাজ"-এর বেণী ঘোষালদের যুগ। বেণী ঘোষালরা জমিদারের অর্থনৈতিক সুবিধার সুযোগ আর বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের অধিকার নিয়ে পল্লীজীবনের লোক-সমাজের চণ্ডীমণ্ডপীয় রূপটিকে বিপন্ন করে তুলল। আমরা দেখেছি, প্রাচীন পল্লীর সংগঠনে যে সাম্যাশ্রিত চণ্ডীমণ্ডপ ছিল এবং যার নেতৃত্ব দিয়েছিল গ্রামের প্রধান, মণ্ডল কিংবা নায়ক, তাদের সেই অধিকারের উপর জমিদার-ব্রাহ্মণের কর্তৃত্ব চড়াও হল। গ্রামের বাদ-বিবাদ মেটানোর জন্য চণ্ডীমণ্ডপের যে সার্বভৌম অধিকার তৈরি হয়েছিল, তা-ও বিপর্যস্ত হল। বিবাদ-বিসংবাদের বিচার হতে লাগল জমিদারি কাছারিতে কিংবা শহরের ফৌজদারি আদালতে।

একদিন জাতধর্মের অধিকারে এক-একটি গ্রামের মধ্যে সকলেই সমান ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্মণদের কৃত্রিম সামাজিক প্রাধান্য। এই প্রাধান্য সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে গড়ে ওঠে নি, লোকায়ত হয় নি। তাই প্রচলিত ঐতিহ্যের সঙ্গে দেখা দিল দ্বন্দ্ব। আগে গ্রামের প্রধান বা নায়ক স্থির হত গ্রামবাসীদের সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। এখন ব্রাহ্মণ কিংবা জমিদারের উচ্চবর্ণের কর্মচারী গ্রামের সর্ববিষয়ে মাতব্বর হয়ে উঠল। আর এই মাতব্বরি গ্রামবাসীদের অসহ্য বিবেচিত হত, কারণ এদের সঙ্গে সাধারণ গ্রাম্য-জীবনের কোনো সাধারণ সত্যের সংযোগ ছিল না। এইভাবে তুর্কি বিজয়ের পর থেকেই বাঙলার পল্লীতে-পল্লীতে যে সংহত চণ্ডী-মণ্ডপীয় সমাজজীবন গড়ে ওঠার প্রয়াস পেয়েছিল, তা শেষবারের মতো ভেঙে পড়ল। ফলত, ক্ষমতার ভর-কেন্দ্র লোকায়ত চণ্ডীমণ্ডপ থেকে আবার নাগরিক রাজশক্তির দিকে ধেয়ে চলল।

ঔপনিবেশিক রাজশক্তি ইওরোপীয় ভাবাদর্শ সামাজিক প্রাঙ্গণে যেভাবে স্তরে-স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তার নিরন্তর প্রবাহে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য ছিল অনিবার্য। এ ব্যাপারে রাজশক্তি তথা রাজ-পুরুষদের উৎসাহ ছিল প্রবল। আর স্বদেশে গ্রহীতা-দেরও উৎসাহের খামতি ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়েছিল যেসব জমিদার, তাদের সন্তান-সন্ততিরা, পয়সাওয়ালা ডাক্তার-উকিল-ইঞ্জিনীয়ারদের ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরেজি ভাষা শিক্ষায়, পাশ্চাত্য আদব-কায়দা রপ্ত করায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ও সম্প্রসারণের প্রত্যাশিত নিয়মেই শিক্ষার অর্থকরী বৃত্তির দ্বার খুলে গেল। ঔপনিবেশিক আর্থ-নীতিক কাঠামোর পরিধিও বিস্তৃত হল। দেশীয় ব্যবসাবাণিজ্যে পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় শহর আর শহুরে জীবনের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠল। এই শহুরে জনসমষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় যেসব পরিবার ধনগরিমা এবং সামাজিক আভিজাত্যের শীর্ষে ছিল, তাদের সন্তানরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাত থেকে নতুন এক সংস্কৃতির নির্মাতারূপে স্বীকৃত হল, তাদের ঐশ্বর্য আর আভি-জাত্যের সূচনা ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামো-তেই। ইতিমধ্যে নতুন ভূমিব্যবস্থায় যে নতুন জমিদার সৃষ্টি হয়েছিল, যারা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় এদেশীয় স্তম্ভস্বরূপ ছিল, তারাও কলকাতায় স্থায়ী শেকড় পুঁতেছিল। জমিদারি থেকে আয় এমন আকর্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে তারা উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে আরও জমিদারি কিনতে থাকে। শোভা-বাজারের দেব-পরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, বড়বাজারের বসাক-পরিবারের স্বর্ণযুগময় ইতিহাস এইভাবেই রচিত হয়েছিল। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র, খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব-পুরুষরা কেউ ছিলেন ক্লাইভ, মিডলটন, র‍্যামরোল্ডের দেওয়ান, কেউ-বা গুইলার, ভেরেস্ট-এর কাছের লোক, আবার কেউ-কেউ রেভেনিউ বোর্ড ইংরেজদের কলকাতার জমিদারি এস্টেটের দেখ-ভাল-কর্তা।[৩৬] স্বভাবতই এদের উপরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদ

ঝরে পড়েছিল, বিত্তের চিরোৎসারী উৎস হিসেবে।

এরই পাশাপাশি, বাঙলার সাবেকি নগর, শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি ধ্বংসের পথে ছুটে চলল অনিবার্য গতি নিয়ে। অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল চণ্ডীমণ্ডপীয় পরিমণ্ডলের অবক্ষয়। পণ্য লেন-দেনের একটি অখ্যাত গঞ্জ যেভাবে কল্লোলিনী কলকাতা হয়ে উঠল, পরিণত হল ঐশ্বর্যশালী মহানগরীতে, আর বাঁধা পড়ল আন্তর্জাতিক বাজারের টানাপোড়নে, তাতে প্রথমেই টান পড়ল বাঙলার পল্লীর পণ্য-সরবরাহকারী মানুষদের দৈনন্দিন রুচিতে। গ্রামের মাটির উজ্জ্বল শস্য ধেয়ে চলল শহর কলকাতায়। কলকাতা অর্থনীতির কেন্দ্র, কলকাতা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র, কলকাতা সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান। ফলে বাঙলার সাবেক শহর ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর, নবদ্বীপের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠল। এদের আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে প্রশ্নাতীতভাবে লগ্ন গ্রামগুলোরও নাভিশ্বাস উঠল। ঢাকার জনসংখ্যা হ্রাস পেল, মুর্শিদাবাদের নবাবি সড়ক মেঠোপথ হয়ে উঠল, নবদ্বীপের টোলগুলো চলতে লাগল কোনোরকমে টালমাটাল পায়ে। আর্থ-সামাজিক কেন্দ্রবিন্দু কলকাতায় স্থানান্তরিত হল, এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু সাংস্কৃতিক দুর্ঘটনা। কারণ, ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্রে ছিন্ন হল। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী, বাণিজ্যিক কুশীলবজীবী আর কোম্পানির ভূমিব্যবস্থায় যারা শহরে ভূস্বামী, তারা সবাই দেশীয় সমাজ থেকেই উদ্ভিন্ন—কিন্তু দেশীয় সমাজ থেকে যোজন-যোজন দূরে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা থেকে উৎসারিত এই রেনেশাঁসের সন্তানরা চণ্ডীমণ্ডপীয় গণজীবনকে কোনো স্বীকৃতি দান করে নি। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে তারা রসদ সংগ্রহ করেছে, কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপবিধৃত গণজীবন থেকে কিংবা গণজীবনবিধৃত চণ্ডীমণ্ডপ থেকে, জীবন-রস আহরণ করেনি। বাঙলার জনজীবন নাগরিক রেনেশাঁসকে দিয়েছে অন্ন, কিন্তু ইংল্যাণ্ড দিয়েছে স্তন্য। তাই এই রেনেশাঁস আত্মপরিচয়ে দীন, মানসজীবনে প্রবাসী, গণজীবনের প্রতি নির্মম, নির্বাক, উদাসীন। আমাদের পিতৃপুরুষদের সনাতন ঐতিহ্যে এর কোনো শিকড় নেই। শিকড়ের সন্ধানও তারা করে নি। এইভাবে, নাগরিক সংস্কৃতির নিত্য অবহেলায়, আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার বঞ্চনায় এবং রাজশক্তির চরম অবজ্ঞায় চণ্ডীমণ্ডপীয় জীবনের জীবনাবসান সম্পূর্ণ হল।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে গ্রামজীবনে কত দ্রুত পটপরিবর্তন হয়েছে, তা সমসাময়িক উপন্যাসে বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তারাশঙ্কর, শরৎচন্দ্র তাঁদের বহু উপন্যাসে ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের ধারে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। "গণদেবতা" তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। আধুনিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রভাবে গণদেবতার অধিষ্ঠান চণ্ডীমণ্ডপ বিপর্যস্ত। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আত্মনিয়ন্ত্রণপ্রচেষ্টা ঔপনিবেশিক যুগের অনুপযোগী প্রতিবেশে কীভাবে প্রতিহত হয়েছে "গণদেবতা" তারই উপাখ্যান। সুলতানি আমলে রাজস্ব আদায়ের যান্ত্রিক বন্ধনী তেমন করে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রামজীবনকে জড়িয়ে ধরতে পারে নি। কিন্তু কোম্পানি আমলে তা গ্রামকে বেঁধেছে অকটোপাসের বাহুতে। কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের জাল সুদূর গ্রামে, গ্রামের অভ্যন্তরে, নিপুণভাবে বিস্তৃত। সে জালের মূল সুতোটি কলকাতায় বাঁধা। গ্রামের লোকের শুধুই কর দেবার দায় আছে, প্রশাসনে কোনো দায়িত্ব নেই। তাই চণ্ডীমণ্ডপ শুধুই স্মৃতির সামগ্রী হয়ে গেল। এই রূপান্তরের রঙ বদলের "গণদেবতা" সাক্ষী। "গণদেবতা"র চরিত্রগুলি প্রায় সবাই সমান অবস্থার গৃহস্থ চাষি। তাদের মধ্যে সমাজনেতার উচ্চ আসনে সমাসীন কোনো অভিজাতবংশীয় নায়ক নেই। কাজেই, এই গ্রাম্যজীবনে গণতান্ত্রিক সাম্যের প্রভাব পরিস্ফুট। তবে, সমাজের এই সাধারণ সমতার মাত্রাকে অতিক্রম করে গেছে চারটি চরিত্র। এক : দ্বারিক চৌধুরী—জমিদারিচ্যুত হয়ে এখন সাধারণ চাষি। অর্থগৌরব হারালেও তার চরিত্র-গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। দুই : ছিরু ওরফে শ্রীহরি পাল—চাষি থেকে জমিদারে উন্নীত আর অর্থ-গৌরব অর্জন করলেও আভিজাত্যের মর্যাদালাভে বঞ্চিত। তিন : দেবু পণ্ডিত—পুঁথিগত আদর্শবাদের আতিশয্যে সে চণ্ডীমণ্ডপের স্বাভাবিক বাস্তবিক গতিধারায় ছন্দপতন ঘটিয়েছে। চার : মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন—ব্রাহ্মণ্য মহিমার ইতিবাচক ঐশ্বর্য নিয়ে বিরোধ-তিক্ত গ্রাম্য-সমাজের ঊর্ধ্বে বিরাজিত। এই চারটি চরিত্রের তল এবং তাপমাত্রা ঔপনিবেশিক অর্থনীতি দ্বারা নির্ধারিত। সমানাধিকারে সংবদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপের যাবতীয় চরিত্রকে এই চতুষ্কোণ সংঘর্ষ চণ্ডীমণ্ডপীয় ঐতিহ্যের ধসকে উপরিতল-দৃশ্য করে তুলেছে। অবশেষে চণ্ডীমণ্ডপীয় সমাজের বন্ধনশক্তি শিথিল হয়ে গেল, সমানাধিকারে যূথবদ্ধ সমাজ সংহতিভ্রষ্ট হয়ে খণ্ডীকৃত হল।[৩৭]

"গণদেবতা"তে দেখানো হয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপের সমাজবন্ধনের শিথিলতা, সামাজিক দলাদলির ক্রূরতা; "পঞ্চগ্রামে" এই শিথিলয় চণ্ডীমণ্ডপের পতন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল। বোঝা গেল, সদ্যোজাত যুগধর্মের সঙ্গে এর সাযুজ্যহীন ব্যবধান। চণ্ডীমণ্ডপের আদর্শের অপ্রতিরোধ্য পতনের পাশাপাশি কোনো নতুন, গ্রহণযোগ্য আদর্শ গ্রামজীবনে দেখা গেল না। ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত বর্জন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অস্বীকার করেছে, বোঝা গেল। বোঝা গেল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম অস্বীকার করে বিশ্বনাথ সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেছে। কিন্তু বোঝা গেল না, সাম্যবাদের আদর্শ, মুখের বক্তৃতা থেকে সমাজের মর্মমূলে সঞ্চারিত, প্রতিষ্ঠিত হতে কত দেরি আছে! বোঝা গেল না, আর কীভাবেই বা তা হবে।

তিন : চণ্ডীমণ্ডপের পরিবর্তিত রূপ; সাম্প্রতিক কালে এর নিহিত সম্ভাবনা

বাঙলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন তিরোহিত হয়েছে, কিন্তু অন্তর্গত ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত আছে। স্বাধীন দেশে জমিদারি-"প্রথার" অবসান হয়েছে, কিন্তু বহাল আছে জমিদারি ব্যবস্থা—অন্য ভাবে, অন্য নামে। আধুনিক জমিদারদের জমি নেই; আছে অর্থ আর সামর্থ্য, আর আছে অধিষ্ঠিত সরকারের সমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা আর প্রভাব। বাঙলার প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী সরকার গ্রামপঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করেছেন। মনে হতে পারে, বুঝি-বা চণ্ডীমণ্ডপীয় পরিমণ্ডল ফিরে এল। ক্ষমতার ভরকেন্দ্র কলকাতার নাগরিক পরিমণ্ডল থেকে গ্রামের সর্বজনীন চণ্ডীমণ্ডপে বহাল হল! কিন্তু তা হয় নি। কেন হয় নি, তার ব্যাখ্যা এখনই জরুরি নয়। তবে এর ফলাফল লক্ষ করলে কারণের উৎসমুখে যাওয়া যাবে। লক্ষ করলে বোঝা যাবে, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ওয়েদার-কক রাইটার্স বিল্ডিঙে নেই। নেই গ্রামপঞ্চায়েতেও। সঠিক কোথায় এর অবস্থান, এর ভরকেন্দ্রটি কোথায় স্থিত হয়েছে, তা রাজ্যের মুখ্য ব্যক্তিটিও জানেন না, জানেন না পঞ্চায়েতের প্রধান ব্যক্তিটিও।

•

ভারতের ইতিহাসে সেকাল থেকে একালে, যখন ক্ষমতার ভরকেন্দ্র অভিকেন্দ্রের দিকে ধেয়ে গেছে, তখনই চণ্ডীমণ্ডপীয় পরিমণ্ডলে গণতন্ত্রের স্থানিক পরিবর্তন হয়েছে। আবার যখন ক্ষমতার ভরকেন্দ্র কেন্দ্রাতিগ বেগে চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে এসেছে, তখনই গণতন্ত্রের সমাজ-বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস, চণ্ডীমণ্ডপ এই উদ্যোগের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপীয় জীবনে গণতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এখানে ব্যষ্টির সিদ্ধান্ত যেমন অমোঘ, অপরিবর্তনীয় ছিল, তেমনি ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পেত। ব্যক্তি ও ব্যষ্টিজীবনের লোকায়ত ভাবনা থেকে উৎসারিত বলে চণ্ডীমণ্ডপ কখনই কেন্দ্রীয় রাজশক্তির তাঁবেদারি করে নি। আবার চণ্ডীমণ্ডপের

প্রধান, নায়ক বা মণ্ডলও কখনও রাজশক্তির সমান্তরাল নায়কে পর্যবসিত হয় নি। তাই চণ্ডীমণ্ডপীয় জীবনে রুলার এবং রুলড, শাসক ও শাসিত সম্পর্ক বিধৃত-সমূহ ঘৃণা ভর করে নি। চণ্ডীমণ্ডপের সিদ্ধান্ত-সংকল্পে সকলেই শাসক, আবার চণ্ডীমণ্ডপীয় সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সকলেই শাসিত। এখানে ক্ষমতার অনুভূমিক সঞ্চারণ যেমন আছে, তেমনি আছে উলম্ব উর্ধ্বায়ন। আর পারস্পরিক স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে স্ফূরিত বলে দমন-পীড়নের প্রশ্নাতীত। এই কারণেই কেন্দ্রীয় রাজশক্তি একে এত সমীহ করেছে।

চণ্ডীমণ্ডপ ধর্মের আবরণ থেকে উদ্গত হয়েছিল যে যুগে, সে যুগে ধর্ম ছিল সমাজভাবনার কেন্দ্রমূলে। এ যুগে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ধর্মের আবরণ খসিয়ে দিয়ে আমরা একে সিভিল সোসাইটির সমান্তরাল করতে পারি। এর মর্মমূলে যে প্রক্রিয়া তা আমরা নতুন করে গ্রহণ করতে পারি। আর ধর্মকে বাদ দেওয়া না গেলেই বা ক্ষতি কী? নানা যুগে ধর্ম তো কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অত্যাচারকে রুখে দিতে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এঙ্গেলস তাঁর "জার্মানিতে কৃষকযুদ্ধ" গ্রন্থে ষোড়শ শতাব্দীর অ্যানাব্যাপটিস্টদের নেতৃত্বে কৃষকদের বিদ্রোহকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এ কারণেই। প্রথম শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম ছিল অত্যাচারের প্রতিবাদী অবলম্বন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলামও তো তাই। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মও তো ছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অবলম্বন। লেনিন এঙ্গেলসের ডুয়েরিং-বিরোধিতা মনে রেখে-ছিলেন আর সেভাবেই তাঁর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। লেনিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাই বলে এঙ্গেলস কিংবা লেনিন কেউই সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মকে উৎপাটিত করতে হবে এমন ফতোয়া জারি করেন নি। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে রাষ্ট্র সাহায্যও করবে না, বিরোধিতাও করবে না। তবে ধর্ম যদি অবৈজ্ঞানিক হয়, অমানবিক হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে যুক্তি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, জোর দিয়ে নয়। ধর্মের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে কখন লড়তে হবে, আর কখন লড়াই মুলতুবি রাখতে হবে, সেটা সংগ্রামী মানুষকে বাস্তব অবস্থার চরিত্র বুঝেই করতে হবে। কিন্তু কখনও সংগ্রাম, কখনও আপোস, এই নীতিতে পাছে সুবিধেবাদ বা নিহিলিজম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাই এই আদর্শগত লড়াইকে শ্রেণীসংগ্রামের বৃহত্তর লড়াইয়ের অঙ্গ করে নিতে হবে। রাশিয়া, চীন, কিউবা, নিকারাগুয়া, এমনকী আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে জোর করে ধর্মাচার বন্ধ করতে গেলে ধর্মভীরুরা বিরুদ্ধ পক্ষে চলে যাচ্ছে। তেমনি আবার বিপ্লবের জন্য লড়াই করতে ধর্মভীরুরাই এগিয়ে আসছে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস, যদি উদ্দেশ্য হয় সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, লোকায়ত জীবনবোধ প্রতিষ্ঠা, তাহলে ধর্মের সঙ্গে আপোস করায় বাধা নেই। আর এই কাজটি করতে পারে বাঙলার চণ্ডীমণ্ডপ। সংসদীয় গণতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতা আর সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের পথ পরিত্যাগ করে চণ্ডীমণ্ডপের যা মূল আদর্শ তাকে শহরেও প্রসারিত করে সমসমাজ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সূত্রনির্দেশিকা

৩২. গৌতম ভদ্র : মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ ' পৃ ৯।

৩৩. এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা এত দ্রুত ও বিপুল পরিমাণে বেড়েছিল যে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য 'ভদ্রলোক' দুর্ভিক্ষ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় ৬০ হাজার পাউণ্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) ইওরোপে পাঠিয়েছিল। Young-husband : *Transactions in India*, 1786, pp 123-24 ; উদ্ধৃত হয়েছে—সুপ্রকাশ রায়। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, ১৯৬৬, পৃ ১৩-১৪।

৩৪. W.W. Hunter : *Annals of Rural Bengal.* pp 37-40.

৩৫. হান্টার, ঐ, পৃ ৫৭।

৩৬. Lokenath Ghosh : *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zaminders, Part II*, Calcutta,1879। তাছাড়াও অরবিন্দ পোদ্দারের, 'রেনেসাঁস ও সমাজমানস' গ্রন্থে এই তথ্যগুলির সূত্র মিলবে।

৩৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। পৃ ৫৫৫-৫৬১।

গ্রন্থসমালোচনা

প্রসঙ্গ কলকাতার মূর্তি-ভাস্কর্য

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অঙ্কন ও ভাস্কর্যশিল্পের গণ্য যে কজন মাননীয় আলোচক আছেন কমল সরকার তাঁদের অগ্রগণ্য। নিজে শিল্পী হবার কারণে তাঁর চোখ সাধারণ শিল্প-আলোচকদের তুলনায় যে অধিক অন্তর্ভেদী হবে, তা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থটি দীর্ঘ বছরের অনুসন্ধান ও যোগ্য বীক্ষণের ফসল। এই বইয়ের উপরি পাওনা এই যে সাধারণ পর্যবেক্ষক ও আলোচকদের মতো তিনি শুধু মূর্তিগুলির নৈয়ায়িক বিচার-বিশ্লেষণই করেন নি, একই সঙ্গে মূর্তির স্মৃতিজড়িত মানুষটির অতি সংক্ষিপ্ত হলেও বিবরণ দিয়েছেন। ফলে, গ্রন্থটি পাঠ করে কলকাতার স্ট্যাচুগুলি দেখতে গেলে উপকৃত হতে হয়। কেননা, ব্যক্তিত্ব ও অবয়বের যোগ্য মেলবন্ধ ঘটছে কিনা তাও বোঝা সহজ হবে দর্শকের।

কিন্তু মুশকিল এই, স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে যে-সব মনীষী-মহাপুরুষদের মূর্তি কলকাতায় বসানো হয়েছে, যেসব শিল্পী-ভাস্কর তা ব্রোনজ বা পাথরে খোদাই করেছেন, তাঁদের সিংহভাগই জীবিতকালের মূল মানুষটিকে দেখেন নি। ফলে, ব্যক্তিত্বনিরুপণ দুরূহ হয়ে উঠতে বাধ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ফোটো বা মুদ্রিত প্রতিকৃতি দেখেই মূর্তিগুলি তৈরি হয়েছে। বেশির ভাগ মূর্তি তাই ব্যক্তিত্বনির্ভর হয় নি।

জীবিতকালে রামকিঙ্কর বেজ কলকাতায় আসতেই চাইতেন না কলকাতার কদর্য মূর্তির নামে করা পুতুল-গুলির দিকে চোখ চলে যাবে বলে। আমি রামকিঙ্করের সঙ্গ করলেও তাঁর ‘কদর্য’ শব্দটির ব্যবহারে তাঁকে আপত্তি জানিয়েছিলাম ; জানিয়ে বলেছিলাম যেহেতু শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই মূর্তিপ্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য, সুতরাং প্রতি-ক্ষেত্রেই সেখানে চিরায়ত ভাস্কর্য-ঐতিহ্যের তুলনামূলক নিরিখ আরোপ করা সম্ভবত যুক্তিযুক্ত হবে না। শান্তিনিকেতনের এক নিষিক্ত সান্ধ্য-আড্ডায় উপস্থিত আরো কিছু সুধী আমার বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। পার্ক স্ট্রীটের মোড় থেকে জেনারেল উটরামের অশ্বারূঢ় অসামান্য ভাস্কর্যটির অপসারণ রামকিঙ্করের কাছে বিশুদ্ধ বর্বরতা মনে হয়েছিল। বর্তমান আলোচক এই মন্তব্যের মানসিকতাটুকু স্বীকার করেন। এখানে বলে রাখা ভালো, রামকিঙ্কর ভারতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ছিলেন বলেই তাঁর মতামতের প্রসঙ্গটি এখানে টেনে আনা হল। বিদেশে আমেরিকায়, লনডনে, প্যারিসের বিভিন্ন রাস্তায় বেশ কিছু মূর্তি-ভাস্কর্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু আমাদের ভালবাসার কলকাতার মতো এত অনুন্নত মানের মূর্তি কোথাও চোখে পড়ে নি। অথচ কয়েক হাজার বছর পেছিয়ে গেলে ভারতীয় মূর্তি-ভাস্কর্যের ঐতিহ্য কিন্তু ভূমধ্যপৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় কোনো অর্থেই ন্যূন ছিল না। তবে আধুনিক ধারার ভাস্কর্য বলতে আমরা যা বুঝি তা এদেশে এসেছে মাত্র দেড় দু-শতক আগে, ভারতীয় হয়ে উঠেছে তারও অনেক পরে। স্বাধীনতাপূর্ব কলকাতায় ইংরেজ রাজপুরুষদের মূর্তি-গুলির গঠননৈপুণ্য যে অনেক বেশি কুশলী ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের বেশিরভাগ মূর্তির সর্বাঙ্গেই যেন কেমন একটা দায়সারা সমাপ্তির ভাব জড়িয়ে আছে। এমন পরিবেশ-অচেতন সংস্থাপনাও ভারতবর্ষে আর কোনো শহরে চোখে পড়বে না। শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা চৌরঙ্গী ও ডালহৌসী অঞ্চলকে স্ট্যাচুর জঙ্গলে পরিণত হতে দিয়েছি। শিল্পসার্থকতার নিরিখে নির্মাণ ও অঙ্গসংস্থাপনার কথা নাই বা আলোচনা করলাম।

এখানেই একটি ক্ষোভের কথা জানিয়ে রাখা ভালো। পাতাল রেলের নির্মাণ-কারণে একসময় দেবীপ্রসাদের করা গান্ধীমূর্তিকে পার্কস্ট্রীটের মোড় থেকে বেশ কিছুটা পশ্চিমে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হবার পর গান্ধীমূর্তিটিকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হবে। পাতাল রেলের নির্মাণ-কার্য শেষ হয়েছে। কিন্তু গান্ধীমূর্তিটিকে আর পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হয় নি। গান্ধীজীর জায়গায় এসেছেন পণ্ডিত নেহরু। নেহরুর মূর্তিটি নির্মাণসৌকর্যে গান্ধী-মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়ই নয়। মূর্তিটি একটু কোলকুঁজো, জানি না লজ্জায় কিনা!

এই মূল্যবান বইটি আমার হাতে এসেছিল বেশ কয়েক মাস আগে। ইচ্ছে ছিল গ্রন্থবর্ণিত প্রতিটি মূর্তি সরোজমিনে দেখব। কিন্তু কয়েকটি মূর্তি দেখার পরই আগ্রহ কমতে আরম্ভ করল। একসময় দেখার টান সম্পূর্ণই হল অন্তর্হিত। ফলে বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখা আর হয়ে উঠল না। খুলে বলি, লাটভবনের পাশে নেতাজীর মূর্তিটি পৌরুষে দীপ্ত হলেও মূর্তির অতি-শিথিল ঢিলাঢালা পোশাক একেবারেই বেমানান হয়েছে। যোদ্ধবেশের পোশাক কখনই ওইরকম হতে পারে না—গ্রন্থকারের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। মাননীয় শরৎ বসুর মূর্তি সুন্দর হলেও ডানহাতের তর্জনী পুরোপুরি লম্ব আকাশ-মুখী হয়ে গিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। বক্তৃতা-রত মূর্তির তর্জনীলক্ষ্য মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হওয়াই স্বাভাবিক, সুদর্শনচক্রধারী আঙুলের মতো হওয়া কখনোই উচিত হয় নি। উচিত হয় নি মহান ঋষি অরবিন্দর মূর্তিটিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের মুখোমুখি বসানো। শ্রীসরকারের লেখা পড়ে জানলাম পণ্ডিচেরি আশ্রমের এক পরিদর্শকদল সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত মূর্তি গড়ার অগ্রগতি নিয়মিত পরিদর্শন করেছিলেন। হায়! তবু অরবিন্দর ব্যক্তিত্বের “অ”-ও ধরা পড়ে নি। শ্রীমা এর নির্মাণপূর্ব মডেল অনু-মোদন করলেও ভালো-না-লাগাকে দৃঢ়ভাবে জানাতেই হয়। মূল লর্ড কার্জনের মূর্তির চাতালেই এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্জনমূর্তিটি থাকার কালে চাতালের চতুষ্পার্শে যে চারটি নারী অঙ্গমূর্তি ছিল তাও সরানো হয় নি! কেন? এইসব ক্রমবর্ধমান হতাশার কারণেই গ্রন্থবর্ণিত মূর্তিগুলি ইচ্ছে থাকলেও আর সরেজমিনে দেখি নি। বইটিই মন দিয়ে পড়েছি।

অপরপক্ষে অতি সাধারণ ভাস্কর্যের রানী রাসমণির সাদা পাথরের মূর্তিটিতে রানীর ব্যক্তিত্ব অনেকটাই এসেছে বলে দেখলেই মন খুশি হয়ে ওঠে। ময়দানে গোষ্ঠ পালের মূর্তিটিতে নিম্নাঙ্গের খেলোয়াড়সুলভ পেশী সুন্দর এলেও মুখ একেবারেই ঠিক হয় নি।

কলকাতার স্ট্যাচু নিয়ে কমল সরকারের নিরীক্ষণের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা একাত্ম বোধ করি, চৌরঙ্গী-ডালহৌসী পাড়ার স্ট্যাচুর জঙ্গলকে অনায়াসেই সারা কলকাতায় আরেকটু ভেবেচিন্তে ছড়িয়ে দেওয়া যেত। ব্যবহারিক প্রয়োজনে কলকাতার ফুসফুসটি এখনো ডালহৌসী অঞ্চলে আটকানো ; জীবিকার প্রয়োজনে সকালের উর্ধ্বশ্বাস মানুষ, বা সন্ধ্যার ক্লান্ত ডালহৌসী-চৌরঙ্গী অঞ্চল থেকে ঘরে ফেরা মানুষ সময় করে কখন এইসব শিল্পকর্ম দেখবে।

আসলে আমিও এই বইটি পড়ার পর বিস্ময়ে লক্ষ করলাম গ্রন্থবর্ণিত অন্তত বিশ শতাংশ মূর্তিই আগে ভালো করে কখনো দেখি নি, বা বলা ভালো তেমন করে চোখেও পড়েনি, যদিও ওইসব অঞ্চলে অসংখ্য-বার গেছি। কমলবাবু বিভিন্ন মূর্তির নির্মাণশৈলী, তার আয়তন, উচ্চতা, নির্মাণের মালমশলা সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, পাঠকের কাছে তা নিশ্চিত বিশেষ মনোযোগ দাবি করবে। আমি তাই ইচ্ছে করেই পুস্তকবর্ণিত স্ট্যাচুগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না।

কলকাতার স্ট্যাচু—কমল সরকার। **পুস্তক বিপণি**, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭। এক শত আশি টাকা।

আরেকটি কথাও আলোচনা শেষ করার আগে উল্লেখ করা জরুরি। ইংরেজ আমলের অধিকাংশ মূর্তিই এখন ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে, দু-একটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও অন্যান্য স্থানে রাখা আছে। ইংরেজ আমলের এইসব সফল ভাস্কর্যচিহ্নগুলি কি কোনো মিউজিয়াম করে একত্র রাখা যায় না? অন্তত আজকের যাঁরা ভাস্কর্যশিক্ষার্থী তাদের অনেকের তাতে উপকার হত। যে উটরামমূর্তির নকলে শ্যামবাজারের একটি অতি নিকৃষ্ট মূর্তি গড়া হয়েছে সেই অসামান্য মূর্তিটিকে দেখলে দর্শক বুঝতে পারতেন পাথর বা ব্রোঞ্জ ধাতুকেও কী করে দৌড় করাতে হয়, কিছু-কিছু বিদেশী ভাস্কর তা কী নিপুণভাবেই না জানতেন।

এই বইটি প্রতিটি গ্রন্থাগারের অবশ্য সংগ্রহের তালিকায় রাখা উচিত, একথা জানিয়েও, একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করছি। এই বইয়ের অধিকাংশ ছবিই ভালোভাবে ছাপা হয় নি। ফলে মূর্তির অঙ্গসংস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়গুলি কিছু-কিছু ক্ষেত্রে বোঝাই যায় না ভালো করে। আশা করব পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটিটুকু শোধরানো হবে।

বাঙলা ভাষায় কলকাতাচর্চা

গৌতম নিয়োগী

কলকাতা শহরের তথাকথিত তিনশ বছর পূর্তি আমাদের আরো একবার বুঝিয়ে দিল যে বাঙালি সমাজ শুধুমাত্র আত্মবিস্মৃত জাতি তাই নয়, তাদের হুজুগেপনাও যে-কোনো প্রবাদবাক্যে স্থান পেতে পারে। নতুবা ১৯৯০-কেন্দ্রিক আয়োজন হতে পারত তেমন এক উপলক্ষ, যাকে ঘিরে ইতিহাস-সচেতন শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সজীব এক নাগরিক জীবনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনার তাগিদে প্রশ্নাকুল হতেন। ভাবা যেত: কী করে তিনটি গ্রামের একদা নিরাড়ম্বর নিস্তরঙ্গ জীবন তিন শতাব্দী অতিক্রম করে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রাণচঞ্চল মহানগরীতে রূপান্তরিত? এই শহর আর শহরের মানুষ-জনের সমাজ ও তার মধ্যেকার সম্পর্ক কেমন করে নানা বিবর্তন, বিপর্যয়, উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে আজও প্রবাহিত? মুশকিল যে আমরা যতখানি গাল-গল্পে, আড্ডায়-রসিকতায়, কিংবদন্তী-রম্যকাহিনীতে আসক্ত, ততখানি ইতিহাস-সচেতন নই; আর তেমনি যতখানি হুজুগে হুল্লোড়-অনুষ্ঠান, বক্তৃতা-ভাষণ, মালা-প্রদর্শনী, আত্মপ্রচারে উন্মুখ, ইতিহাসের নিরিখে আত্মনিরীক্ষণে ততখানি আগ্রহী নই। তাই উপরি-প্রলেপে যত বেশি হইচই, তার অন্তঃসারশূন্যতা আমাদের পীড়া দেয়; কলকাতার বাবু কালচারের জঘন্য ক্যারিকেচার কেন্দ্রীয় সরকারি গণমাধ্যমে রসিয়ে পরিবেশন করা হয়; রাজ্য-সরকারি উদ্যোগে সঙ সাজিয়ে ট্রামের মধ্যে ভাঁড়ামো আনন্দের নামে বিতরিত হয়; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সরকারি-বেসরকারি আপিস থেকে পাড়ার ক্লাবে পর্যন্ত বক্তৃতা-উৎসবের ফুলঝুরি ছোটে আর সুযোগ বুঝে ছোটো-বড়ো-মাঝারি নানা প্রকাশক নানারকম যোগ্য-অযোগ্য লেখককে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাণিজ্য করতে; প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় নানা খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের। এইসব উদ্যোগ-আবেগের স্রোত বইলে ঠেকায় কে? তখন ভারতে ঔপনিবেশিকতার অন্যতম অগ্রদূত এক সাম্রাজ্যবাদী সওদাগর কলকাতার জনকের শিরোপা পেয়ে যান; এমনকী প্রবীণ ইতিহাসবিদ আত্মমর্যাদা লঙ্ঘন করে এই শহরের নামই দিয়ে বসেন সিটি অব চার্নক। তবু এইসব আদিখ্যেতা, বাড়াবাড়ি, অপাঠ্য রচনার ছড়াছড়ির মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রমী কলকাতা-চর্চার নিদর্শন রেখে গেলেন কিছু সন্ধিৎসু মানুষ। কলকাতা শহরের ইতিহাসের মতো কলকাতাচর্চার ইতিহাসেরও একটা ধারা প্রবহমান, সে কথা স্মরণ রাখলে আমরা ব্যতিক্রমগুলি চিহ্নিত করতে পারি, এবং সেই চিহ্ন অনুসারে দেবাশিস বসু-সম্পাদিত গ্রন্থ দুটি কেন ব্যতিক্রম তাও বোঝা সহজ হয়।

বাঙলা ভাষায় ইতিহাসচর্চা আজ বিশেষ আদৃত। বস্তুত এখন ইতিহাসচর্চার প্রধান দুই বৈশিষ্ট্য মাতৃ-ভাষায় ইতিহাসচর্চা এবং ধর্মনিরপেক্ষ-বিজ্ঞানসম্মত-বস্তুবাদী ইতিহাসচর্চা। আধুনিক স্বীকৃত পদ্ধতিতে কলকাতা শহরকে নিয়ে প্রথাসিদ্ধ ঐতিহাসিক গবেষণা ইংরেজিতে দু-চারজন করলেও বাঙলা ভাষায় বাঙালি বুধমণ্ডলী করেন নি, এটা লজ্জাজনক। 'আর্বান হিস্টরি' বলতে পেশাদার ঐতিহাসিকদের মধ্যে কত বৈচিত্র্য ও গভীরতা এসেছে তা বোঝা যায় পৃথিবীর নানা শহরের ইতিহাস-বিষয়ক বইগুলি থেকে। কলকাতাচর্চাই বা ইতিহাসবিদদের উপেক্ষিত থাকবে কেন? যাক, যা বলছিলাম; একদা সাহেব-লেখকদের রচনা বাদ দিলে, বাঙলা ভাষায় কলকাতাচর্চা—উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া সত্ত্বেও—নানা ধরনের উপাদান ব্যবহার করে স্বীকৃত প্রকরণ-পদ্ধতি মেনে ইতিহাসপদবাচ্য খুব কমই হয়ে উঠতে পেরেছে। ইংরেজি ভাষায় কলকাতার ধারাবাহিক রচনার প্রথম প্রয়াস অতুলকৃষ্ণ রায়ের—যা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি ৭ম খণ্ডের ১ম ভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে পড়ছে। তারপর বিনয়কৃষ্ণ দেব লেখেন তাঁর *The Early History and Growth of Calcutta* বইট (১৯০৫)। দুটি গ্রন্থই মূল্যবান, প্রথমটির বঙ্গানুবাদ সম্প্রতি বেরিয়েছে, আমি পড়ি নি; দ্বিতীয়টি সুবলচন্দ্র মিত্র-সঙ্কলিত "কলিকাতার ইতিহাস" শীর্ষক অনুবাদে (১৯০৭) অবশ্য দেখেছি। বিদেশী এবং দেশী লেখকদের ইংরেজি রচনা আপাতত আলোচনার বাইরে রাখছি। বাঙলায় কলকাতার সামগ্রিক ইতিহাস রচনার কথা উঠলে প্রথমেই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের কথা মনে পড়ে। কেন সে কথা একটু পরেই বিস্তারিতভাবে বলব, শুধু দুটি কথা এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে বাঙলা ভাষাতে কলকাতা নিয়ে একখানা সম্পূর্ণ বই লেখার আইডিয়া তাঁর মাথায় প্রথম আসে, যদিও তিনি লিখেছিলেন সাময়িকপত্রে ধারাবাহিকভাবে এবং কলকাতার দেশীয় সমাজের দিকে তিনিই প্রথম দৃষ্টি দেন। অর্থাৎ পাঁজির আক্ষরিক হিসেবে না হোক, তাৎপর্য এবং গুরুত্বের বিচারে প্রাণকৃষ্ণ পথিকৃৎ। এই ইতিহাস ঘরানার আরো যেসব বইপত্র রয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য: হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "কলিকাতা সেকালের ও একালের" (১৯১৫), প্রমথনাথ মল্লিকের "কলিকাতার কথা" (আদিকাণ্ড, ১৯৩১; মধ্যকাণ্ড, ১৯৫৫), হরিহর শেঠের "কলিকাতা পরিচয়" (১৩৪১) বা "প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়" (১৯৫২) থেকে হালফিল নকুল চট্টোপাধ্যায়ের "তিন শতকের কলকাতা" (১৩৭৯), রাধারমণ মিত্রের "কলিকাতা দর্পণ" (১ম পর্ব, ১৯৮০), নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায়-সম্পাদিত "প্রাচীন কলকাতা" (১৩৯০), নিশীথরঞ্জন রায়ের "প্রসঙ্গ: কলকাতা" (১৯৮৬) এবং "কলকাতা: ইতিহাসের উপাদান" (১৯৮৯), নিশীথরঞ্জন রায় ও সুনীল দাস-সম্পাদিত "পুরনো কলকাতার কথা (১৯৮৯) ইত্যাদি। অতুল সুর এই গোষ্ঠীতে পড়েন, তবে তাঁর লেখার গভীরতা কম। যেমন, রম্যরচনার ঘরানায় হলেও প্রয়াত বিনয় ঘোষের লেখা "কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত" (১৯৭৫) ইতিহাস-গন্ধী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হবে, "কলকাতার পুরাকথা"-সম্পাদনাসূত্রে দেবাশিস বসু 'ভূমিকা'য় যথার্থই লিখেছেন, 'বাঙলা ভাষায় কলকাতাচর্চার প্রধান ধারা রম্যরচনাকেন্দ্রিক।' রম্য অর্থাৎ লঘু কিন্তু আদৌ অপাঠ্য নয় অতীব সুখপাঠ্য বরং, তবে তা ইতিহাসপদবাচ্য নয়। এই শ্রেণীভুক্ত অনেকে—তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় নিখিল সরকার, পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রাণতোষ ঘটক, নারায়ণ দত্ত, হরিপদ ভৌমিক

কলকাতার পুরাকথা—সম্পা. দেবাশিস বসু। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। একশ টাকা।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। সম্পা. দেবাশিস বসু। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। একশ দশ টাকা।

প্রমুখ। আর সেকাল কিংবা একালে যেসব গাইডবুক, নকশা, গালগল্প, কুলজী বা পরিবার-পরিচয়, মন্দির বা দেবস্থান পরিচয়, কলকাতার শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-কেন্দ্র প্রভৃতির বিবরণ, স্মৃতিচারণ তার অধিকাংশই কলকাতাচর্চার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তবে তা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার বিবেচনায়, কলকাতা-চর্চার প্রভূত অবকাশ এখনো রয়ে গেছে। বহু-বহু বিষয়ে ফাঁক আছে বা আদৌ আলোচনাই হয় নি। এই পটভূমিকায় দেবাশিস বসু-সম্পাদিত গ্রন্থ দুটির প্রকাশকে স্বাগত জানাই। গ্রন্থ দুটি সংগ্রহযোগ্য, কেননা কলকাতা বিষয়ক বহু তথ্য এগুলিতে সংগ্রথিত। সুন্দর কাগজ, সুন্দর মলাট এবং মুদ্রণ ইত্যাদি দর্শনধারী ব্যাপার ছাড়া গুণবিচারেও দুটি উচ্চাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করে পুস্তক বিপণি সাধু কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

কলকাতা যে মুমূর্ষু নগরী নয়, যত সীমাবদ্ধতাই থাক এমত ঘোষণা যে নেহাত অপপ্রচার তা যেমন সত্য, তেমনি কলকাতার সমাজ যে সজীব, সচল ও সভ্য তা বোঝা যায় আত্মপরীক্ষার প্রয়াসে। দেবাশিস বসু সে কাজে যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁর নিষ্ঠা, শ্রম, অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় এত নিখাদ যে বর্তমান সমালোচক অভিভূত ও মুগ্ধ। শ্রদ্ধাস্পদ কলকাতাচর্চা-বিশারদ রাধারমণ মিত্র যদি হন প্রবীণতম, তবে দেবাশিস বসু সন্দেহ নেই আধুনিকতম। তরুণ কিন্তু আন্তরিক; তাঁর কাজের মধ্যে জড়িয়ে আছে পুরানো কলকাতাকে জানার আগ্রহের আড়ালে এই শহরের প্রতি মমতা। সেই মমতা আর আন্তরিকতার স্বাক্ষর বহন করছে সমালোচ্য বই দুটি। "কলকাতার পুরাকথা" একটি প্রবন্ধসঙ্কলন, যার মধ্যে প্রায় চার শ পৃষ্ঠার পরিসরে সম্পাদক জড়ো করেছেন সতেরোটি রচনা, কলকাতার নানা প্রসঙ্গে। সঠিকভাবে বলতে গেলে শেষ তিনটি রচনা অবশ্য প্রবন্ধ নয়, পঞ্জী বা তালিকা। তবে এই কাজকে এককালে থ্যাঙ্কলেস জব বলা হলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন এই কাজে কত শ্রম আর তথ্য-নিষ্ঠা লাগে। তাই স্বতন্ত্রভাবে দেবাশিস বসু ("কলকাতার পল্লীনাম"), উদয়ন মিত্র ("কোম্পানীর চিঠিপত্রে কলকাতার নগরায়ণ—একটি বিষয়ভিত্তিক তালিকা") এবং অশোক উপাধ্যায় ("বাংলা ভাষায় কলকাতাচর্চা")-কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানাই। বাকি চোদ্দটি রচনা তুল্যমূল্য নয় ঠিকই, তবে কোনোটিই উপেক্ষণীয় নয়।

প্রথম রচনাটি—"কলকাতার প্রাচীনত্ব"—লেখক ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, এক কথায় অনবদ্য। এই সংকলনের অন্যতম সেরা লেখা। ঔপনিবেশিক লেখকরা এবং তাদের ধ্বজাধারী ভারতীয় লেখকরা (এখনো যাঁদের সাক্ষ্যং অলভ্য নয়) অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক ভাবে কলকাতার প্রাচীনত্ব হয় অস্বীকার করেছেন, নতুবা মাথা ঘামান নি। কোম্পানির পুঁজিবাদী বণিকদের শিরোপা পরিয়েই তাঁরা গদ্‌গদ। ভূখণ্ড হিসেবে কলকাতা কত প্রাচীন তা প্রাচীন বিবরণী, ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও রেণুবিজ্ঞানীদের আবিষ্কারলব্ধ নানা চাঞ্চল্যকর উপাদানের আলোকে এমন প্রামাণিক-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে মুগ্ধ হয়ে পড়ার মতো। প্রাক্-চার্নক যুগে কলকাতা যে একটি বিশিষ্ট জনপদ ছিল, তা মধ্যযুগের সাহিত্যের আলোকে দেখিয়েছেন সুখময় মুখোপাধ্যায়। নতুন তথ্য অবশ্য কম।

গত তিন শ বছরে কলকাতার নানা ধর্মের আর নানা বর্ণের উপাসনালয়-কেন্দ্রিক স্থাপত্য বিষয়ে চারটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ লিখেছেন তারাপদ সাঁতরা, গণেশ লালওয়ানী, অলোক রায় এবং বিমল-কুমার পাল। বিষয় যথাক্রমে "কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য", "কলকাতার জৈন মন্দির", "কলকাতার নেটিভ গির্জা" এবং "কলকাতার দুর্গাদালান"। তারাপদ সাঁতরা এ কাজে খুবই যোগ্য ব্যক্তি, তার আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে এই শহরে পুরাকীর্তি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দিরের অভাব নেই, যেগুলির রীতি-অলংকরণ-রূপান্তরের সানুপুঙ্খ আলেখ্য সাজিয়েজেন শ্রী সাঁতরা। লেখাটি উচ্চস্তরের। তাঁর সরেজমিন অনুসন্ধান আমাদের মুগ্ধ করে। মন্দিরনির্মাণের সমাজতাত্ত্বিক দিকটি আলোচিত হলে ভালো হত। গণেশচাঁদ লালওয়ানী পণ্ডিত মানুষ, তাঁর জৈন মন্দির-বিষয়ক রচনাটি আরো সবিস্তার হতে পারত। তেমনি বিমল-কুমার পালের লেখায় কলকাতার অজস্র দুর্গাদালানের মধ্যে মাত্র পাঁচটির কাহিনী। নির্মাণরীতি ও অলং-করণও অনালোচিত। স্থানাভাবে? অলোক রায় কলকাতার সব গির্জা নয়, শুধু 'নেটিভ'দের জন্য যেসব চার্চ হয়েছিল তার মধ্যে যে-তিনটির পরিচয় দিয়েছেন, খুবই তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা। এর পরের পাঁচটি লেখা মূল্যবান, তবে যতখানি তথ্যবহুল ততখানি বিশ্লেষণাত্মক নয়; এসব লেখা সাধারণ পাঠকদের কাছে চিত্তাকর্ষক না হলেও নাগরিক বিকাশ জানতে জরুরি। লেখাগুলি হল "কলকাতার করারোপ" (পূর্ণেন্দুনাথ নাথ), "কলকাতার পুলিশ প্রশাসন" (স্বপন বসু), "কলকাতার হাসপাতাল" (বিনয়ভূষণ রায়), "কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থার ইতিহাস" (আশুনাথ মুখোপাধ্যায়)। একই মন্তব্য প্রযোজ্য "কলকাতার পুকুর" (হরিপদ ভৌমিক) সম্পর্কেও।

কলকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকেও যে সম্পাদকের নজর ছিল তা বোঝা যায় বাকি তিনটি রচনার দিকে তাকালে। নগরজীবনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিপ্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ। সে বিষয়ে সিদ্ধার্থ ঘোষ আমাদের উপহার দিয়েছেন উপভোগ্য এক নিবন্ধ, নাম "পুরনো কলকাতার কলকব্জা"। সিদ্ধার্থ যথার্থই লক্ষ করেছেন যে প্রযুক্তিপ্রয়াস যা হয়েছে, তা ঘটেছে ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় এবং ঔপনিবেশিক বিদেশী শাসকদেরই শিল্পবিকাশের সঙ্গে তার যোগ অচ্ছেদ্য, তবু কলকাতার কলকব্জার ইতিহাসে বৈচিত্র্যপূর্ণ গৌরবের নায়ক কিছু বাঙালিও। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রণীদের আমরা ভুলি নি, কিন্তু কারিগরি ক্ষেত্রে পথিকৃৎদের অনেকে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যেতেন, সিদ্ধার্থ ঘোষের মতো আধুনিক গবেষকগণ সেদিকে নজর দেওয়াতে আমরা কৃতজ্ঞ। নগরবিনোদনের অঙ্গ শিল্প ও নাট্যচর্চা। "কলকাতার চারুকলা সমিতি"-র প্রসঙ্গটি দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন কমল সরকার। ভারি সুন্দর লেখা, তথ্যঋদ্ধ অথচ সরস। শঙ্কর ভট্টাচার্যের "কলকাতার সাধারণ নাট্যশালা" হয়তো প্রত্যাশিত ধরনের বড়ো নয়। তার জন্য লেখক দায়ী নন, কারণ একশ বছরের ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে লিখতে গেলে প্রবন্ধের পরিসর নয়, গোটা বই দরকার।

আসলে শুধু লেখক কেন, সম্পাদকেরই তো অনেকাংশে হাত-পা বাঁধা। কলকাতার ইতিহাসে শুধু অদ্যাবধি আলোচিত দিকগুলি নিয়ে বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে উপযুক্ত লেখার আয়তন বরাদ্দ করতে গেলে তিরিশ ফরমার তিনখণ্ড বই ছাপতে হয়। সম্পাদকীয় ভূমিকায় দেবাশিসের আর্তি: 'সংকলনটির নানা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেল। মুসলিম উপাসনালয়ের মতো অনালোচিত থেকে গেল আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' এ বিষয়ে আমার অভিমত দু-চার কথায় ব্যক্ত করি। কলকাতার মুসলিম উপাসনালয় সম্পর্কে একাধিক লেখককে অনুরোধ করেও লেখা না পাওয়াটা দুঃখের। কারা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন জানি না। প্রসঙ্গত বইতে দেখছি লেখক-পরিচিতি দেওয়া নেই। দেওয়া উচিত ছিল। শুধু নেটিভ গির্জা কেন, সমগ্র খ্রীষ্টীয় উপাসনালয় থাকলে বা ব্রাহ্ম উপাসনালয় থাকলে ভালো হত। বিনোদনপ্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন অবশ্য থাকতে পারত কলকাতার গানবাজনার রূপ ও রূপান্তরের কাহিনী, সংগীত সমিতির বিবরণ, খেলা-ধুলার বিষয়ে একটি লেখা এবং উৎসব-মেলা নিয়ে একটি লেখা। তেমনি সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কালের প্রহরী নানা শিক্ষাপীঠ, পাঠাগার, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকেন্দ্র এবং পত্রিকা তথা মুদ্রণ ও প্রকাশন নিয়ে রচনা প্রয়োজনীয় হত। প্রত্যেকটি বিষয়ে বহু ভ্রান্তি ও চর্চিতচর্বণ চলছে। তবে একখণ্ড বইয়ের

আয়তনের কথা ভেবেই সম্পাদকীয় পরিকল্পনার ত্রুটি মার্জনীয়। বরং কৃতিত্ব স্বীকার্য। তবে অন্য দু-একটি দিক সম্পাদককে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তিনি জানিয়েছেন, 'নিবন্ধগুলিতে প্রধানত তথ্যই পরিবেশিত হল, তত্ত্ব নয়।' ভালো কথা। তথ্য অবশ্যই মূল্যবান এবং প্রাথমিক আকর; কিন্তু শুধু তথ্য পর-পর সাজিয়ে দিলে তা যত চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, উপযুক্ত বিশ্লেষণের অভাবে, পটভূমিকায় এবং তাত্ত্বিক কাঠামোয় বিচার না করলে, তা অ্যালবামে-সাজানো ছবি হয়, ইতিহাস হয় না। দ্বিতীয়ক, প্রাক্-চার্নক যুগ যখন মর্যাদা পেয়েছে তখন গত তিনশ বছরের নগরায়ণ নিয়ে লেখা নেই কেন? তৃতীয়ত, মন্দির-মসজিদ-গির্জা, দালান, হাসপাতাল, পুকুর, পুলিশ, কর, নিকাশী ব্যবস্থা, চারুকলা, নাট্যশালা—এসব কাদের জন্য? মানুষদের জন্য তো। জনগণই তো ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু, অথচ কলকাতার মানুষজন নিয়ে লেখা থাকবে না তা কি উচিত? বিষয়টি ব্যাপক এবং কঠিন। তবু কলকাতার জনবিন্যাস ও বসতি-বিস্তার—তার আদিরূপ, বিবর্তনের ধরন, নানা পরিবর্তন, বাঙলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে মানুষের পরিযান, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সমাজ, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জনজাতির সমাজ, সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব-বৈষম্য, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, নানা বৃত্তির মানুষদের জগৎ, বিশেষত নিম্নবর্গের মানুষদের কথা—এসব 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' কি অনালোচিতই থাকবে? কলকাতার পুরাকথা মানেই কি শুধু পুরাকীর্তি?

প্রাণকৃষ্ণ দত্তের "কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা" বইটির বর্তমান সংস্করণে সম্পাদকের কৃতিত্বে আদ্যন্ত চেহারাই বদলে গেছে। অধিকন্তু হিসেবে 'অন্যান্য রচনা' হিসেবে বর্তমান সংস্করণে জুড়ে দেওয়া হয়েছে দত্তমশায়ের 'ভল্লুক-পালিতা কন্যা', 'ব্রাহ্ম প্রচারকের ভ্রমণ-সমাচার', এবং 'বদ্‌মাএস জব্দ'। উপযুক্ত কাজ হয়েছে। তেমনি সঙ্গত হয়েছে আগের সংস্করণে যুক্ত শরচ্চন্দ্র দেবের "কলিকাতার ইতিহাস" বাদ দেওয়া। ছুটো লেখার তুলনাই চলে না। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ছিলেন নববিধানগোষ্ঠীভুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক, প্রখ্যাত সমাজকর্মী এবং 'অনাথবন্ধু' নামে পরিচিত। নানা কারণেই প্রাণকৃষ্ণের কলকাতা-কাহিনী মূল্যবান—তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা হল কলকাতার দেশীয় সমাজ সম্পর্কে অত তথ্য আর কোথাও নেই। 'সম্পাদকীয় সংযোজন' খুবই প্রয়োজন ছিল, তবে আমার বিবেচনায় একটু অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়েছে যার মধ্যে বেশ কিছু প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যেত যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে কলকাতা সম্পর্কিত নয়।

'রক্তবন্যা', 'হত্যাকাণ্ড' এবং 'পরম বিশ্বাসের গন্ধ'

কান্তি গুপ্ত

"রক্তবন্যা" ইন্দিরা পার্থসারথির তামিল ভাষায় রচিত 'কুরুদিপ্পুনাল' উপন্যাসের বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদক সুত্রমণিয়ম কৃষ্ণমূর্তি উপন্যাসের উৎস প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তামিলনাড়ুর ধনভাণ্ডার বলে বিখ্যাত তাঞ্জাউর জেলার কীলা ওয়েণমনি গ্রামে ষাট দশকের দিকে এক রাতে তথাকথিত নিচু জাতের খেতমজুরদের একটি বস্তি পুড়ে যায়। অনেক খেতমজুর সপরিবারে মারা

রক্তবন্যা—ইন্দিরা পার্থসারথি। সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র-ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী-১১০০০১। ১৯৮৯। ত্রিশ টাকা।

হত্যাকাণ্ড—সুব্রত সেনগুপ্ত। প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৭। এপ্রিল, ১৯৯০। বাইশ টাকা।

পরম বিশ্বাসের গন্ধ—কামাল হোসেন। প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৭। এপ্রিল, ১৯৯০। পনের টাকা।

যান। আগুন লাগিয়েছিল ভূ-স্বামীরাই। ...এই ঘটনা প্রবলভাবে আঘাত দিয়েছিল বিখ্যাত তামিল লেখক ইন্দিরা পার্থসারথিকে। এই আঘাতের ফলেই "কুরুদিপ্পুনাল" উপন্যাসের জন্ম।'

সমগ্র উপন্যাসের কাহিনীগঠনে এবং ঘটনাবিন্যাসে উল্লিখিত অগ্নিকাণ্ডের উৎস খোঁজার প্রয়াস লক্ষণীয়। এবং এ প্রয়াসে ইন্দিরা পার্থসারথি রাজনৈতিক সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন সর্বত্রই। স্বাধীনতার পর কয়েক দশক পেরিয়ে এল ভারতবর্ষ; পরিবর্তন অবশ্যই এসেছে। ভদ্রলোকের ভারতবর্ষের গণতন্ত্র পরিচালনায় পার্লামেন্ট রয়েছে, মন্ত্রিসভা আছে, প্রশাসন-আইন-আদালত-ফৌজদারির তীক্ষ্ণ নজরের অভাব নেই। কিন্তু অপরিবর্তনীয় রয়ে গেল সনাতন ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক বেদীতে অধিষ্ঠিত জাতি-বৈরিতা আর ধনী-দরিদ্রের অসাম্যের দেবতা। ল্যাণ্ডসিলিং-এর নামে প্রহসনের দৃশ্যাঙ্কে ভূ-স্বামীর রক্তচক্ষু আর কৃষককুলের আর্তনাদ এখনো প্রধান উপকরণ। ইন্দিরা পার্থসারথি উপন্যাস রচনায় এসব বাস্তব উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত উপাদান ব্যবহারে স্মরণ রেখেছেন যে, তামিলনাড়ুর দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ সংঘাতের প্রাবল্য ঝিমিয়ে গেলেও তা এখন বাহিত হয়ে চলেছে শূদ্রশ্রেণীর মধ্যে। সেখানে উচ্চ-বর্ণীয় শূদ্রের কাছে অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ বিদ্বেষ আর ঘৃণার পাত্র। এই ঘৃণা আর বিদ্বেষ কত ভয়ঙ্কর পার্থসারথি "কুরুদিপ্পুনাল" উপন্যাসে তাকে সঞ্চারিত করেছেন সৃজন শক্তির সাহায্যে।

মোট পনেরটি পরিচ্ছেদে গঠিত উপন্যাসটিতে ভূস্বামীর সঙ্গে ভূমিহীনের, ধনীর সঙ্গে গরিবের এবং উঁচু জাতের সঙ্গে নিচু জাতের সংঘর্ষ প্রধান স্থান পেয়েছে। এবং সত্যিকারের বিপ্লব সম্পর্কে কিছু আভাসও রয়েছে এই কাহিনীতে, 'সত্যিকার বিপ্লবের শেষ নেই, শেষ হওয়া উচিতও নয়। সুতরাং এদেশে শেষ বিপ্লব নয়, মহাবিপ্লব ঘটানো উচিত। আর এটা ঘটাতে হবে গ্রামে' (১৪২ পৃষ্ঠা)। এবং হয়তো এই বিপ্লবের নেতৃত্ব সম্পর্কেও ঔপন্যাসিক তাঁর ধারণা আভাসিত করতে চেয়েছেন, "আমাদের দেশে বিপ্লব করতে হলে সেটা গ্রামবাসীদের নেতৃত্বে গ্রামেই করা সম্ভব। আমাদের শহরগুলো একরকম মেকি 'সংস্থা'। শহুরে নেতাও তাই সত্যিকারের নেতা হতে পারে না" ১৪১ পৃষ্ঠা)।

উপন্যাসের নায়ক গোপাল আর শিব দুই বন্ধু। উভয়েই দক্ষিণ ভারতের লোক। তবে দিল্লীতেই এদের স্থায়ী বসবাস। উভয়েই দক্ষিণভারতের গ্রামের জাত-পাত সমস্যা, ভূস্বামী-খেতমজুর সংঘর্ষ প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তথাপি গ্রামের সমস্যার সঙ্গে এরা জড়িয়ে পড়ল অনিবার্য অবস্থায়। গোপালের পিতা ব্রাহ্মণকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে দিল্লীতেই বিয়ে-থা করে সংসার পেতেছিলেন। গোপাল দিল্লীতেই সমাজ-বিজ্ঞানীর অধ্যাপক। কিন্তু দুবছর হল সে দেশের পৈতৃক ভিটায় বসবাসের উদ্দেশ্যে এসে পাশের গাঁয়ে অবস্থান করছে। গোপালের খোঁজে দিল্লী থেকে বন্ধু শিবের আগমন ঘটল সেই গ্রামে। শিব-এর পৈতৃক ভিটেও কাছাকাছি গ্রামেই। গ্রামের ভূস্বামী শূদ্র জাতের কান্নায়া নায়ুডু। তার ঘৃণা অন্ত্যজ শ্রেণীর (পরোয়া) মানুষদের প্রতি। ভূস্বামীরূপে খেত-মজুর-দের ঠেকাতে সে জোতদারদের নিয়ে পাল্টা সংগঠন গড়েছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন কয়েকজন ছাড়া কেউ তাকে ভালো চোখে দেখে না। ব্যক্তিগত জীবনে যৌন শক্তির অক্ষমতা সত্ত্বেও সে মেয়েঘটিত ব্যাপারে বংশের গর্ব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। নায়ুডুর সঙ্গে গোপালের ব্যক্তিগত আড়াআড়ি না হলেও কমিউনিস্ট নেতা রামেয়ার বাড়িতে শিক্ষিত গোপালের বসবাস বা বডিবলুর দোকানে খাওয়া নায়ুডু শুধু পছন্দই করে না, সন্দেহের চোখে দেখে। বডিবলু, কান্নায়া নায়ুডুর পিতার রক্ষিতা-পুত্র, তাকে নায়ুডু ঈর্ষা করে ওর যৌন সক্ষমতার কারণে। ঈর্ষা আক্রোশে পরিণত হয়। বডিবলুকে নায়ুডু উৎখাত করতে চায় তার দোকান ভেঙে দিয়ে। এ ব্যাপারে আবেদন জানাতে গোপাল

নায়ুডুর বাড়িতে উপস্থিত হলে নায়ুডু গুণ্ডাদের দিয়ে মারাত্মকভাবে গোপালকে আঘাত করে গাঁয়ের নিম্ন-বংশীয়া বিধবা পাপ্পাত্তির বাড়ির পেছনে ফেলে রেখে দেয়। গাঁয়ের নিচুজাতের লোকদের গোপালের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতেই নায়ুডুর এই পরিকল্পনা। নায়ুডুর ষড়যন্ত্রের জাল আরো বিস্তৃত হল। বলিবড়ু আর পাপ্পাত্তিকে সে তার রক্ষিতা পঙ্কজনের বাড়িতে লুকিয়ে রাখল। গোপাল মধ্যবিত্তসুলভ হঠকারিতায় বডিবলু আর পাপ্পাত্তিকে উদ্ধার করতে গিয়ে রক্ষিতা পঙ্কজনের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এদিকে যখন খেত-মজুরদের আন্দোলন জোরদার হতে চলেছে তখন নেতা রামেয়া গ্রেপ্তার হল। নায়ুডুর চক্রান্তে খুন হল নায়ুডুর অনুগত কাট্টোয়ান আর বিধবা পাপ্পাত্তি। রামেয়ার অনুপস্থিতিতে খেতমজুরদের আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ল গোপালের ওপর। গোপালের সঙ্গে আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ল শিব। ইতিমধ্যে ভূস্বামী নায়ুডুর বাড়ির ধান লুঠ করল মজুরেরা। প্রতিশোধ নিতে নায়ুডু হরিজনদের বস্তিতে একদিন রাত্রে আগুন ধরিয়ে দিল। পুলিশের সামনেই পুড়িয়ে মারল বস্তির মেয়েদের, শিশুদের। শিবু গ্রেপ্তার হয়েছে, গোপালের সঙ্গী এখন বডিবলু। গোপাল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের একজন নিরুপায় দর্শকমাত্র। কান্না ছাড়া তার আর কিছু করার নেই।

ঔপন্যাসিক এই অসহায়তায় উপন্যাসের কাহিনী বৃত্তের সমাপ্তি টানেন নি। গোপালের পক্ষে ঔপন্যাসিক সংকল্প গ্রহণ করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, 'গোপাল শোষিত, অত্যাচারপীড়িত, খুন হওয়া গরীব মজুরদের রক্তবন্যায় স্নান করবে। ওদের শক্তি গোপালের মধ্যে প্রবেশ করুক ভয়হীন অযুকের।'

"রক্তবন্যা" সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসন ও নিপীড়নের বলিষ্ঠ দলিল। উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তে, ঘটনাপ্রবাহে তামিল পল্লীর জাতপাতের রেষারেষি, উচ্চবর্ণীয় ভূস্বামীর হিংস্রতা, উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণীয় সংঘর্ষ, মন্ত্রী আর পুলিশের ভূস্বামীর সহায়করূপে কর্মকাণ্ড এবং সমাজের অবক্ষয়ের পরিচয় সুস্পষ্ট করে তুলতে ঔপন্যাসিক তাঁর সামর্থ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অবশ্য ভূস্বামী নায়ুডুর ক্রূরতা আর হিংস্রতার উৎস অনুসন্ধানে ঔপন্যাসিকের মনোবিজ্ঞানী দৃষ্টি সামন্ত-তান্ত্রিক চরিত্রকে চিহ্নিত করায় যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। শ্রেণীগত চরিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করা অপেক্ষা তিনি জোর দিয়েছেন ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর। এর ফলে ঘটনাক্রমে অপেক্ষাকৃত স্থান পেয়েছে ভূস্বামী নায়ুডুর যৌন-অক্ষমতার বিষয়টি। গোপালের ভাবনায় পাঠকমনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, ভূস্বামী নায়ুডুর ক্রূরতা আর হিংস্রতার মূল উৎস হল তার শারীরিক গঠনবৈকল্য। গোপাল বলে, 'জন্মগত এই অক্ষমতাই নায়ুডুর প্রতিটি কাজকে প্রভাবিত করে বোধহয়। এটা সমাজের উপর একটি ব্যক্তিবিশেষের আক্রোশ। যারা এরকম আক্রোশ পোষণ করে তারা না করতে পারে এমন কোনো কাজ নেই' (পৃ ৭১)। হরিজন বস্তিতে আগুনে মেয়েদের-শিশুদের পুড়ে মরতে দেখে পুনরায় গোপালের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক একই ভাবনাকে পাঠকমনে স্থায়ী করতে চেয়েছেন, 'নায়ুডু তার শপথ পালন করেছে। প্রকৃতি তাকে বঞ্চিত করেছিল বলে সে তার প্রতিশোধ নিয়েছে মেয়েদের ও বাচ্চাদের আগুনে আহুতি দিয়ে' (পৃ ১৭৫)। এরকম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রবণতা-হেতু ভূস্বামী ও খেতমজুরদের সংঘর্ষের প্রয়োজনীয় কথার পরিবর্তে যৌন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে সমধিক। বলিবড়ু-পাপ্পাত্তি, নায়ুডুর রক্ষিতা পঙ্কজন-গোপাল প্রসঙ্গ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"রক্তবন্যা" উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক আর সামাজিক বিষয়ে অভিমতসমূহ মাঝেমধ্যেই ঘটনাপ্রবাহে এবং চরিত্রের অন্তর-ভাবনায় স্থান করে নিয়েছে। সবক্ষেত্রেই এরকম অভিমতসমূহ রসসমৃদ্ধির আয়োজনকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, এমন নয়। অনুবাদক ইন্দিরা পার্থসারথির পরিচয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "(তিনি) 'কলাকৈবল্যবাদী' বা 'শুদ্ধ নান্দনিকতা'র পক্ষপাতী নন। তিনি হচ্ছেন যথার্থবাদী, সামাজিক দায়িত্বশীল লেখক।" হয়তো সেই কারণেই এই উপন্যাসে বাস্তব সত্যকে অধিকতর সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে বাস্তব সত্যকেই রেখাঙ্কিত করার প্রয়াস সুস্পষ্ট।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ইন্দিরা পার্থসারথির "কুরুদিপ্পুনাল" উপন্যাসটির বাঙলা অনুবাদ "রক্তবন্যা" বাঙলা অনুবাদসাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। অনুবাদক সুব্রমনিয়ম কৃষ্ণমূর্তিকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। বাঙলা ভাষার পরিমণ্ডলে তিনি সার্থক-ভাবে বিচরণ করেছেন এবং উপন্যাসটির প্রতি বাঙালি পাঠকের আগ্রহ সজীব রেখেছেন। কখনো-সখনো শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাস কিঞ্চিৎ বেমানান ঠেকে বটে তবে ভাষান্তর-কর্মে বিশ্বস্ত থাকার প্রয়াসে এমন ত্রুটি অপরিহার্য বলেই মেনে নিতে হয়। "রক্তবন্যা"র প্রচ্ছদের বিষয়ের আভাস ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা অন্তঃপ্রচ্ছদে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রতিলিপিমুদ্রণ সাহিত্য অকাদেমির সযত্ন প্রকাশনার পরিচয়বাহী।

"রক্তবন্যা" উপন্যাসে বর্ণিত শোষণ, অন্যায়-ব্যভিচার, জাতের নামে বজ্জাতিতে জর্জরিত বর্তমান ভারতবর্ষের নিঃসহায় নিরুপায় মানুষের দুর্বিপাকের কথায় ভারাক্রান্ত মনে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত পল্লী-ভারতবর্ষের রূপ ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '…দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে, মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তমাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ মানুষের আহার জোগাচ্ছে, যে দেবতা তাঁদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সে দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে হাসছে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে করাঘাত করে বলছে "অদৃষ্ট"। দেশের সেই পলেটিশিয়ান আর দেশের সর্বসাধারণ উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।'

দেশ এবং দেশের রাজনীতি এখনো একই ধারায় বহমান—ইন্দিরা পার্থসারথি'র "কুরুদিপ্পুনাল" উপন্যাসে এই ছবি সুস্পষ্ট। রসদৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করেই বোধদৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেছেন ইন্দিরা পার্থসারথি।

সুব্রত সেনগুপ্তর "হত্যাকাণ্ডে" মন্টুর যন্ত্রণা—'পরিস্থিতি পালটানোর শক্তি তার নেই। …সে তো কিছুই করে না, কখনো করতে পারে না। তার পালানোর চেষ্টা সব সময়। সেই পালানো বা লুকানোও হয়ত উটপাখির মুখ লুকানোর চেষ্টার মতোই। কেন সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না? পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে না, পারে না নিয়ন্ত্রণ করতে?' মন্টুর এই যন্ত্রণাকেই আশ্রয় করে সুব্রত সেনগুপ্ত "হত্যাকাণ্ডে"র কাহিনী গড়ে তুলেছেন।

পুরোনো বন্ধু, রাজনৈতিক দলের কর্মী চাকুর সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে মন্টুর দেখা হয়ে গেল। মন্টু এখন কোনো অফিসের কর্মচারী, চাকুর কাছে আঁতেল, শিক্ষিত ভদ্রছেলে। কিন্তু চাকুকে সে ভয় পায়, তাকে অমান্য করার ক্ষমতাও তার নেই। সুতরাং সমাজ-বিরোধী শঙ্কুকে দেখে যখন সে ধাওয়া করল চাকু, তখন মন্টুও ছুটল শঙ্কুকে ধরতে চাকুর পিছু-পিছু। ছুটতে-ছুটতে একরকম রোমহর্ষক অবস্থায় শঙ্কুর মৃত্যু প্রায় অবশ্যম্ভাবী বোধ হল দুজনের কাছে। হত্যাকাণ্ডের দায় এড়াতে চাকু মন্টুকে নিয়ে তুলল কলকাতার বাইরে, বন্ধু বনমালীর বাড়িতে। মন্টু তো নিজের ইচ্ছায় চলতে পারে না। চাকুর অনুরোধ, আদেশ, পরামর্শ ই তো তাকে চালায়। তবে আদর্শবাদী মন্টুর সেখানে আত্মগোপন করে থাকা হয়ে উঠল না বনমালীর বউ অলকার যৌন প্রগল্‌ভতায়। মন্টু কলকাতায় ফিরে এলে পিসিমার মৃত্যু হল। পিসিমার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী বাপের ভিটেতে ছাই পুঁততে সে এল দেশের বাড়িতে দুবছর আগের রেজেস্ট্রি-করা বউ জয়াকে নিয়ে। সেখানেও দুর্ভাগ্য মূর্তিমান। পিতা বরদাকান্ত ছিলেন 'ঠাকুর দেবতার মতো চরিত্তিরের লোক'। তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে নির্বাচনে ফয়দা

লুটতে শুরু হল দুই রাজনৈতিক দলের রেষারেষি-হানাহানি। মন্টু চায় না বাবার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোক সুতরাং মূর্তিপ্রতিষ্ঠার বিরোধিতার কথায় সে জড়িয়ে পড়ল রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে। অতঃপর তাকে এবার বউকে নিয়ে কলকাতায় পালাবার পালা। কিন্তু মন্টু স্থির করল, সে 'আর পালাবে না, কতবার পালাবে সে?' মন্টু রয়ে গেল দেশের বাড়িতেই। জয়ী হল তার আত্মশক্তি।

লেখক মন্টুর ভাবনায় জানিয়েছেন, 'মন্টুর পরিষ্কার পরিকল্পনা নেই, সিদ্ধান্ত নেই। সে যেন ভেসে চলেছে পরিস্থিতি যে দিকে টেনে নিয়ে যায় সেইদিকেই।' "হত্যাকাণ্ডে"র কাহিনীবৃত্তের অধিগত ঘটনাক্রমের ক্ষেত্রেও এরকম পরিকল্পনাহীন পরিস্থিতির টানে ভেসে চলার ব্যাপারটি বড়ো চোখে ঠেকে। কাহিনীবৃত্তের ক্ষেত্রেও পরস্পরবিচ্ছিন্ন দুটো পর্ব যেন একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্ব, হত্যাকাণ্ডের দায় এড়াতে শহরতলিতে বলমালী-অলকার গৃহে মন্টুর আত্মগোপন। দ্বিতীয় পর্ব পিসিমার ছাই নিয়ে মন্টুর দেশের বাড়িতে বসবাস। মূল "হত্যাকাণ্ডে"র ভাববীজের অঙ্কুরোদ্গমে এই দুইটি পর্বের মধ্যে সংযোগ নির্ণয় করতে কিছু বেগ পেতে হয় বৈকি! ধন্দ থেকে যায়। বৃত্তের ঐক্য নিয়ে লেখক ভেবে দেখার অবকাশ পান নি।

প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনায় স্থান পেয়েছে সমকালের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, কর্মীর গুণ্ডামি, আদর্শহীন নেতার জীবন, দলাদলি; সাধুজির আশ্রম, গুরুমা; নিম্নবিত্ত পল্লী; নিম্নবিত্ত জীবন, পূজা-অর্চনা; যৌন বিক্ষেপ—টুকরো-টুকরো অনেক ছবি। কিন্তু পরিণত সৃজনৈপুণ্যের ক্ষীণতায় সব উপকরণ যেন অবান্তর, আরোপিত। সংগৃহীত উপকরণের বিশৃঙ্খল-ভিড় নিটোল ভাবের ঐক্যে দূর করতে হয়; রসপ্রবাহে বাহিত করে পাঠকের উপভোগ্য করে তোলার জন্যে কবিকল্পনাকে সক্রিয় ও সজীব রাখায় লেখককে সতর্ক নজর দিতেই হয়। সুব্রত সেনগুপ্তের "হত্যাকাণ্ড" পড়তে-পড়তে এরকম নানাবিধ ভাবনায় আস্বাদনের ব্যাঘাত এড়ানো গেল না।

কামাল হোসেনের "পরম বিশ্বাসের গন্ধ" উপন্যাসটির পরিচয় সহৃদয় পাঠকের আনন্দসরূপ চৈতন্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়ার কাছাকাছি পর্যন্তই ঔপন্যাসিক সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। জানিয়েছেন, 'প্রিয় পাঠক, এ কাহিনী একটি আধাশিক্ষিত সুখাভিলাষী অতি-সাধারণ মুসলমান পরিবারের ক্রমিক রূপান্তরের পথে নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে এগিয়ে চলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে রূপান্তর ঘটেছে এই সংসারের আশেপাশের জগতে, শান্তিপ্রিয় প্রচ্ছন্ন একটি ছোটো মফসল শহরের ওপর। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রতিনিয়ত একটি সমাজের যে রূপান্তর ঘটেছে তাতে সুফিয়া, শফিউল, নাজমা, রাবেয়া, সামসুল, রফিক—অংশ নিয়েছে সবাই। কিন্তু অনুভূতি উদ্বেল হয়েছে দিনে-দিনে বেড়ে ওঠা সুফিয়ার চোখের তারায়।' উদ্ধৃত অংশটি ভূমিকা নয়, উপন্যাসেরই অংশ।

"পরম বিশ্বাসের গন্ধ" কিশোরী সুফিয়ার বয়ঃসন্ধি-পর্বে রূপান্তরের গতির সৌন্দর্যকে ঔপন্যাসিক সম্ভোগ্য করে তুলেছেন। এই কালপ্রবাহে খণ্ড-খণ্ড, তুচ্ছ, অতিসাধারণ ঘটনাগুলিকে নিপুণ শিল্প-সচেতনতায় একসূত্রে গ্রথিত করে অখণ্ড জীবনভাবনাকে রসমণ্ডিত ও উপভোগ্য করার আয়োজন সর্বত্রই প্রধান স্থান নিয়েছে। সতেরোটি পরিচ্ছেদে গঠিত এই উপন্যাসে প্লট অপেক্ষা স্থান নিয়েছে ঘটনাপ্রবাহ। এই ঘটনা-প্রবাহ অগ্রসর হয়েছে নায়িকা সুফিয়ার একান্ত-ভাবনার মধ্য দিয়ে। অবশ্য সুফিয়ার একান্ত ভাবনার মাঝে-মাঝে উপস্থিত হয়েছে শফিউল। সেখানেও ঔপন্যাসিক মগ্ন চৈতন্যকেই অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান দিয়েছেন।

উপন্যাস শুরু হয়েছে কোনো একদিন স্কুল থেকে ফিরে সুফিয়ার একাকী গৃহে অবস্থানের মধ্য দিয়ে। সেদিন সুফিয়া কিশোরী, অতঃপর স্কুল-গণ্ডি পেরিয়ে

সুফিয়া উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রীরূপে কলেজে প্রবেশ করেছে, 'দেহ-মনের রূপান্তর ঘটেছে প্রত্যহ এবং প্রতিদিন।' কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে সুফিয়ার মার চিকিৎসার জন্যে কলকাতা যাওয়ার পূর্বরাত্রে 'প্রকৃতির মতো অনন্ত বিস্ময়ে ভরা নারীসত্তার স্বপ্নাবেশে।' এই কালপর্বে সুফিয়া উপলব্ধি করেছে মা নাজমার অপরিজ্ঞাত আর্তনাদ, পিতা শফিউলের সঙ্গে মা নাজমার মিলনে দুরন্তের বাধা। দেখেছে তার দিদি, শান্ত নীরব রাবেয়ার সামসুলের কাছে আত্মসমর্পণ ও ঘর বাঁধার আয়োজনে পিতার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার সাহস। উপভোগ করেছে সহপাঠিনী জোনাকির সান্নিধ্য, কিশোরী স্মৃতির প্রেম-প্রেম খেলার বিচিত্র কাহিনী। কিশোরী-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত পরিমণ্ডলে আভাসিত হয়েছে নকশাল আন্দোলনের পুরোভাগের যুবক রফিক আর ফুফাতো ভাই হুমায়ুন সুফিয়ার অনুৎসাহের মধ্যেই স্থান করে নিয়েছে স্বল্প পরিসরে। উপেক্ষিত থাকে নি মফসসল শহরের বয়ঃসন্ধিপর্বের অলস নিষ্কর্মা যুবক সম্প্রদায়ের মেয়েদের সম্পর্কে আগ্রহের আত্যন্তিকতা; লোফার দিব্যেন্দার সঙ্গে অধ্যাপিকা সুজাতা (দি)-র রেজিষ্ট্রি বিবাহ; এমন অনেক—'প্রত্যেকের ভিন্ন পথে অনির্দেশ যাত্রা।' মোট চারটি পরিচ্ছেদে রয়েছে শফিউল ইসলামের (সুফিয়ার বাবা) আত্মভাবনার স্থান। 'শফিউল মফসসলের এক সাধারণ মুসলমান পরিবারের ছেলে। ...লোভ লালসা এবং অর্থের মোহ তাঁকে যেমন গোঁড়া মুসলমান করতে পারে নি, তেমনি পারে নি সমাজের কিংবা সংসারের স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে আটকাতে।...অমানবিক পথে জয়লাভটা তাঁর কাছে অনেক বেশি আনন্দদায়ক।' দীন-দরিদ্রের প্রতি মিথ্যা সহানুভূতি দেখিয়ে তিনি তাদের সম্পত্তি করায়ত্ত করেছেন। তিনি জীবনের প্রারম্ভে ওভার-সিয়ার দত্তবাবুর কাছে জেনেছিলেন, টাকা রোজগারের কমপিটিশনে শুধু দৌড়ুতে হয়, থামা যায় না। এখন তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে শহরের অর্থবানদের অন্যতম। স্বপ্ন দেখেন, 'দাশনগরের মতো তিনি শহরের নাম পালটে 'শফিনগর' গড়ে তুলবেন। যৌথ পরিবারে বসবাসের কৈশোর কালের ছবি তাঁকে আনমনা করে, স্ত্রী রাবেয়ার প্রতি তিনি নির্মম, কিন্তু মাঝে-মাঝে কান্না ওঠে, নাজমাকে তিনি বোঝেন নি, ঘনিষ্ঠতার মেলবন্ধন সাজানোয় তাঁর অবকাশ ঘটে নি কোনো-দিন।

কামাল হোসেনের "পরম বিশ্বাসের গন্ধ" জানায় যে, 'সত্য বর্ণনাই নভেলের উদ্দেশ্য, লাভালাভ বিচার করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। এই পৃথিবীতে আমরা যে বস্তু যেরূপ দেখিতে পাই, সেই বস্তুটি যথাযথ রূপে বর্ণিত করিলেই উপন্যাস-লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।' কামাল হোসেনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। তিনি গভীর কবি-কল্পনায় গড়ে তুলেছেন মানস প্রতিমাকে। আর সেই সূত্রেই তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর সমাজসচেতন দৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রেখে চারপাশের পরিবেশকে। স্বভাব-বর্ণনায় তিনি শিল্পীর কুশলতার পরিচয় রেখেছেন। মফসসল শহরের মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনস্পন্দনকে তুলে ধরতে কোনো আদর্শায়িত দৃষ্টিভঙ্গির অধীনতা তিনি গ্রহণ করেন নি। চরিত্রকে তিনি বর্ণনা করতে চান নি, বরঞ্চ চরিত্রের গতিপ্রকৃতির দিকেই অপেক্ষা-কৃত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। ফলে প্রধান এবং অপ্রধান কুশীলব dominant features of an individual-এর প্রাধান্যে পূর্ণাঙ্গ নয়। সুফিয়া যেন পর্বত-গাত্র থেকে নেমে আসা ঝরনা। ঔপন্যাসিক ঝরনার দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টি সম্প্রসারিত করেছেন, নদী হয়ে ওঠার দিকে মনোযোগ সাধন করেন নি। শফিউল চরিত্রটি বর্ণিত হয়েছে, কার্যকারণ-সম্বন্ধে ক্রিয়াবান হয়ে ওঠে নি। ঔপন্যাসিকের এওতো এক বিশেষ রুচি ও মর্জি। এই বিশেষ রুচি ও মর্জির কারণেই নাজমার আর্তনাদটুকু শ্রুত হয় মাত্র, মনস্তাত্ত্বিক মাত্রার উগ্র পরিচয় রাখার প্রয়াসে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না। নাজমা-শফিউলের দাম্পত্য সংঘাতের ছবি এঁকে কৌতূহল উত্তুঙ্গ করে তোলায় ঔপন্যাসিক উদাসীন

থেকেছেন। অনায়াসে উপন্যাসের এই পরিমণ্ডলে এ নিয়ে একটা মেলোড্রামাটিক ভাবাবেগ সৃষ্টি করা যেত। কিন্তু চমৎকারিত্ব অপেক্ষা ঔপন্যাসিক লক্ষ রেখেছেন সৃষ্টির সৌন্দর্যকে অব্যাহত রাখায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সীমায় রাবেয়া-সামসুল ঘর বেঁধেছে নীরবে। প্রত্যাসন্ন ঝড় ঔপন্যাসিকের উপেক্ষায় কোনো আশ্রয় পায় নি। নকশালপন্থী যুবক রফিককে সুফিয়ার স্বপ্নের সঙ্গে জুড়ে বিপ্রলম্ভ রসের সঞ্চারে পাঠকবর্গকে ব্যাকুল-স্বর্গে উপনীত করার সম্ভাবনাকে এড়ানো সৎ ঔপন্যাসিকের একটি বিশেষ গুণ, দক্ষতাও বটে। কামাল হোসেন লক্ষ্যপথে অচঞ্চল থেকেছেন, পথভ্রষ্ট হন নি।

কামাল হোসেন সুফিয়ার দেহ-মনের রূপান্তরের রেখাঙ্কনে তাঁর ক্যানভাসে রঙ মেখেছেন চারপাশের জগতের—পশ্চিমবাঙলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের। সে রঙে আভাসিত হয়েছে এই বাঙলার 'বিরাট এক হিন্দু সম্প্রদায়ের ছায়ার নীচে প্রায় অদৃশ্য, প্রায় পরিচয়হীন মুসলমান সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দমিশ্রিত একটি নিটোল পরিবার জীবন। আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকারে এখনো মুসলমানদের একাধিক বিয়ে, তালাক প্রভৃতি বিষয়ে বহুবিধ অলীক ধ্যান-ধারণা বিরাজমান। প্রচলিত ধারণা মিথ সৃষ্টি করে, এবং সেটাই স্বার্থান্বেষীদের প্রচারে ক্রমে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে সাধারণের কাছে। মুসলমানপ্রধান মুর্শিদাবাদ জেলার মফসসল শহরের পটভূমিকায় কামাল হোসেন এসব ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে কিছু ঘাঁটি বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। শফিউল ইসলামের মতো স্বার্থান্বেষীদের প্ররোচনায় কীভাবে পাকিস্তানে গিয়ে পুনরায় দেশে ফিরে ভিখারিতে পরিণত হয়েছে অসংখ্য সাধারণ মুসলমান—দৃষ্টির ঔদার্যে, চরিত্রের স্বরূপটিকে ব্যক্ত করতে এসব কথাও লেখক উপেক্ষা করেন নি। মাইনরিটির হীনম্মন্যতা প্রসঙ্গও এসেছে একই প্রবাহে। উপন্যাস আলোচনায় এসব প্রসঙ্গের অবতারণা নেহাতই কমলবনে মত্ত হস্তীর পদসঞ্চার। তথাপি ঔপন্যাসিকের সমাজ-সংলগ্নতা বোঝাতে এসব কথা এসেই পড়ে।

"পরম বিশ্বাসের গন্ধে" ভাবাবেগময় প্রতিক্রিয়ায় চড়াই-উতরাইয়ের উৎক্রান্তি নেই, পরিবর্তে আত্ম-সংলাপী গতিক্রমে পাঠক-হৃদয়কে স্পর্শ করার আয়োজনই বড়ো হয়ে উঠেছে। এবং এই সূত্রেই উপন্যাসের গল্পে কবির অনধিকার-প্রবেশ সহজেই স্বীকৃতি পেয়েছে, অনর্থের কারণ হয়ে ওঠে নি। জীবনের প্রথম প্রহরে সুফিয়ার জেগে থাকার সৌরভ মনকে পরিতৃপ্ত করে। অনাঘ্রাত সুফিয়ার সঙ্গে সম্মিলনও ঘটে যায়। সুফিয়া যে 'নির্বাক স্বপ্নের মালা গাঁথে' তা গভীর অনুভূতির অন্তর্গত হয়ে পড়ে।

পুরস্কৃত গ্রন্থ "পরম বিশ্বাসের গন্ধে" রয়েছে কামাল হোসেনের লেখনীপ্রতিভার ঔজ্জ্বল্য। আরো বৃহত্তর পটভূমিকায় কামাল হোসেনের ঔপন্যাসিক প্রতিভা উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দেবে, এরকম প্রত্যাশা খুব অসঙ্গত নয়।

উত্তরবঙ্গ চর্চায় মধুপর্ণী

রণেন্দ্রনাথ দেব

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট পত্রিকা "মধুপর্ণী" গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরসীমান্তবর্তী জেলাগুলির ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি বিষয়ে আলোচনার যে চেষ্টা চালাচ্ছেন তা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। এ পর্যন্ত তাঁরা যে তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন সেগুলির প্রতি গবেষক-দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

মালদহ জেলা সংখ্যায় এই জেলা গঠনের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি বিষয়ে আলোচনা করেছেন ড. আনন্দগোপাল ঘোষ। গৌড়বঙ্গের উপেক্ষিত ঐতিহাসিক অঞ্চল ও পুরাতত্ত্ব প্রবন্ধটিতে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অচিন্ত্য বিশ্বাস রচিত "মালদহে শ্রীচৈতন্য" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও বিভিন্ন তথ্যের আকর। "পালনগরী মদনাবতী ও উইলিয়ম কেরী" লেখাটিও যুক্তিপূর্ণ। "মালদহে নীলচাষ, নীলকুঠি ও নীল বিদ্রোহ" এবং "মালদহের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ঐতিহ্য" প্রবন্ধ দুটি মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ মালদহের লোকসংস্কৃতিবিষয়ক। ড. হরিপদ চক্রবর্তী গম্ভীরা আর আলকাপ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু আলকাপ শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত গ্রহণীয় মনে হয় না—এ সম্বন্ধে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সিদ্ধান্তই বোধ হয় বেশি যুক্তিসহ। বাঙলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক জ্ঞানেন্দ্র নন্দীগুপ্ত সম্বন্ধে নতুন করে অনেক কিছু জানা গেল। মালদহের পূর্বসূরী গ্রন্থকারদের জীবনালেখ্য প্রবন্ধে আবীদ আলি খান, ইলাহি বক্স, রাধেশচন্দ্র শেঠ, রাজেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিনয়কুমার সরকার বাগেশ্বর দাস, শিবরাম চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম হোসেন, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, হরিদাস পালিত, কুমুদনাথ লাহিড়ী ও হেনরী ক্রেটনের জীবন ও কীর্তিকথা বিবৃত হয়েছে। তবে দু-এক স্থলে তথ্যগত বিভ্রান্তি চোখে পড়ল। বিনয়কুমার সরকার, যতদূর জানি, ইংরাজি সাহিত্যে নয়, ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন। মালদহ জেলার লোকসংস্কৃতি প্রবন্ধে উপকথা ও ফকিরালি গানের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে ছক ব্যবহার করা হয়েছে তা কি খুব প্রাসঙ্গিক এবং রস উপভোগের সহায়ক? চমস্কির উল্লেখ ও বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার অবান্তর বলে বোধ হয়। "মালদহের মৌলিক ভাষা" প্রবন্ধটিও এই দোষে দুষ্ট।

জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যাটিতে প্রথমদিককার প্রবন্ধ-গুলিতে জেলার ভৌগোলিক পরিচয়, ভূতাত্ত্বিক রূপরেখা, নদীপরিচয় এবং বন আর বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে আলোচনার পর ইতিহাসের উপাদানের পটভূমিকায় জলপাইগুড়ি সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। জেলার পুরাকীর্তি, মন্দির, মসজিদ ও গির্জা বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ আছে। জলপাইগুড়ি জেলার সামাজিক কাঠামো, ডুয়ার্সে ভূমিরাজস্বব্যবস্থার বিবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ডুয়ার্সের চা-বাগান এই প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা আন্দোলন, আদিবাসীর আন্দোলন বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। স্বভাবতই আলোচকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে কোচ মেচ রাভা টোটো প্রভৃতি জনজাতির আর্থসামাজিক বিবর্তনের প্রতি। ধামগান, লোকসঙ্গীত, লোকশিল্প, লোকনাট্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাগুলি চিত্তাকর্ষক। শেষের দিকে দেওয়া সাক্ষাৎকার দুটিও দামি তথ্যে ভরপুর।

কোচবিহার জেলা সংখ্যাটি আকারে এবং উৎকর্ষে পূর্বোক্ত সংখ্যা দুটিকে ছাড়িয়ে গেছে। সংখ্যা-

---

মধুপর্ণী—সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট।

বিশেষ মালদহ জেলা সংখ্যা ১৩৯২। সংখ্যা-সম্পাদক—গোপাল লাহা। সহ-সংখ্যা-সম্পাদক—রূপেশ সরকার। সম্পাদকমণ্ডলী : অজিতেশ ভট্টাচার্য, ড. শ্যামলকুমার ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দত্ত, প্রতিভা সরকার, ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, গোপাল লাহা, হরেন ঘোষ, রতন দাস, সুধীরচন্দ্র সরকার, স্বপ্না ঘোষ, শঙ্কর চক্রবর্তী, শিবানী রায়, কমলেশ দাস, শিবায়ন ঘোষ, বাবুল সরকার, সোমক চক্রবর্তী। পনেরো টাকা।

বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৩৯৪। সংখ্যা-সম্পাদক—আনন্দগোপাল ঘোষ। সংযোগী সংখ্যা-সম্পাদক—বিমলেন্দু মজুমদার। সম্পাদকমণ্ডলী—চিত্তরঞ্জন দত্ত, ড. শ্যামলকুমার ঘোষ, গোপাল লাহা, প্রতিভা সরকার, হরেন ঘোষ, সুধীরচন্দ্র সরকার, শিবানী রায়, কমলেশ দাস, স্বপ্না ঘোষ, রতন দাস। পঁচিশ টাকা।

বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬। সংখ্যা-সম্পাদক—আনন্দগোপাল ঘোষ। সম্পাদকমণ্ডলী—কৃষ্ণেন্দু দে, শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, স্বপনকুমার রায়, নৃপেন্দ্রনাথ পাল, কমলেশ দাস। চল্লিশ টাকা।

সম্পাদকের লেখাটিতে কোচবিহারের পুরাবৃত্ত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এর পর দেওয়া হয়েছে জেলার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান ও সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক পরিচয়। প্রাক্‌কোচ পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং কোচরাজবংশের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস—তথ্যপূর্ণ লেখা। কোচবিহারের আর আসামের ইতিহাস একসূত্রে বাঁধা। কোচবিহারে ইতিহাসচর্চায় অসমীয়া ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে লিখেছেন ড. নগেন্দ্রনাথ আচার্য। রাজন্যশাসিত কোচবিহার একদা বাঙলার সাংস্কৃতিক জগতে উচ্চ আসন অধিকার করেছিল। কোচবিহারে নারী-শিক্ষার বিবর্তন, কোচবিহারের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা, রাজন্যশাসিত কোচবিহারের সাহিত্যসাধনা—এই প্রবন্ধগুলি সেই যুগের আলেখ্য। একটি অত্যন্ত সুলিখিত ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ সুখবিলাস বর্মা রচিত "লোকসঙ্গীতে কোচবিহার"। সাক্ষাৎকার অংশে অমিয়ভূষণ মজুমদারের রেখাচিত্রটি মনোজ্ঞ হয়েছে। রাজপরিবার সম্বন্ধে আরো দুয়েকটি প্রবন্ধ থাকলে খুশি হতাম।

জেলাসংখ্যাগুলির মোটামুটি পরিচয় দেবার পর সাধারণভাবে দুয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। এই ধরনের জেলাভিত্তিক আলোচনার গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এই আলোচনা-গুলিকে ভ্রমমুক্ত, তথ্যভূয়িষ্ঠ, নবীন আবিষ্কারের সরসতায় পূর্ণ করতে হলে লেখকদের এবং সম্পাদক-মণ্ডলীকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, জেলাভিত্তিক আলোচনাগুলিতে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে—ঐতিহাসিক, আর্থসামাজিক ও লোকসংস্কৃতি-মূলক।

প্রথমে ধরা যাক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য আলোচনা করেছিলেন পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও চৌধুরী আমানতউল্লা। আলোচকেরা এঁদের দুজনের গ্রন্থ থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যদি এঁদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে পরবর্তী কালে সংগৃহীত তথ্যাদির পরিচয় দেওয়া হত তাহলে পাঠকেরা উপকৃত হতেন। আসাম এবং কোচবিহারের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই সংযোগের ইতিহাস আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হলে ভালো লাগত।

আর্থসামাজিক বিবরণের জন্য এখনো আমরা জেলা গেজেটিয়ারগুলির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। "মধুপর্ণী"র বিশেষ জেলা-সংখ্যাগুলি গেজেটিয়ারের কিছুটা সম্পূরক হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে আরো অনেক কিছু করণীয় ছিল বলে মনে হয়। বিশেষত উপজাতি-দের সম্বন্ধে আমাদের জানার কৌতূহল সম্পূর্ণ তৃপ্ত হল না। ড. চারুচন্দ্র সান্যালের প্রদর্শিত পথে নতুন-নতুন গবেষক আসুন—এই আমাদের কামনা।

লোকসংস্কৃতির আলোচনাও ব্যাপক গবেষণার উপর নির্ভরশীল। আজকাল লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণে নানাপ্রকার রীতির ব্যবহার দেখা যায়। এই রীতিগুলি সবই গ্রহণযোগ্য কিনা জানি না। কিন্তু বিশ্লেষণের পূর্বে উপাদান সংগ্রহ বেশি জরুরি। "মধুপর্ণী" এই কাজটি অঙ্গীকার করলে সুখী হই।

জেলা-সংখ্যাগুলি পাঠ করে অনেক নতুন খবর জানতে পেরেছি। একদা কোচবিহারকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য কোনো-কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্যোগী হয়েছিলেন—এই খবরটি জানা গেল। বস্তুত ভারতভুক্তির সময় দেশীয় রাজ্যগুলি কী দোটানায় ছিল, তা পূর্ণভাবে চিত্রিত হওয়া উচিত। কোচবিহারের রাজপরিবারের অবদান বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা থাকলে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হত। আমাদের ধারণা, ভারত-ভুক্তির পর কোচবিহারকে যদি ত্রিপুরার মতো একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হত তবে এর উন্নতি হত সর্বাঙ্গীণ।

সর্বশেষে একটি কথার উল্লেখ না করে পারছি না। বাঙলা গদ্যের উদ্‌ভব আর বিবর্তনের ইতিহাস খুব-

প্রাচীন নয়। কিন্তু বিষয়নিষ্ঠ আলোচনার উপযোগী গদ্যরীতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের হাতে সেই রীতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন বাঙলা গদ্য এলোমেলো অবিন্যস্ত ঢিলেঢালা হওয়া উচিত নয়। অথচ আমাদের অধিকাংশ গদ্যরচনাটি শিথিল, যুক্তিশৃঙ্খলাবর্জিত রূপে লিখিত হচ্ছে। "মধুপর্ণী"র সম্পাদক যদি লেখাগুলির মার্জনায় মনোনিবেশ করেন এবং এত বেশি লেখককে আমন্ত্রণ না জানিয়ে কতগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয় বেছে নিয়ে কিছু-কিছু শক্তিশালী আলোচককে শুধু লেখার দায়িত্ব দেন, তাহলে সংকলনগুলির ধার আর ভার দুই-ই বাড়বে।

আমাদের হার্দিক অভিনন্দন

চতুরঙ্গ দপ্তরে নিয়মিত যেসব লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আসে, তার মধ্যে মেদিনীপুর শহর থেকে প্রকাশিত "সময়সরণী" এবং "অমৃতলোক", কলকাতা থেকে প্রকাশিত "সমতট", "সংবেদন", ইদানীংকালে প্রাপ্ত "অন্তঃসার", মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে প্রকাশিত "খনন" ইত্যাদি পত্রিকাগুলি প্রায়শই অমূল্য সৃষ্টিসম্ভারে পরিপূর্ণ থাকে।

পৃথকভাবে এইসব সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ না থাকায় আমরা বেদনা বোধ করি। সৎ সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধনায় মগ্নচিত্ত এইসব পত্রিকার সম্পাদকদের উদ্দেশে জানাই আমাদের হার্দিক অভিনন্দন। এঁদের এই মহৎ প্রয়াস দীর্ঘজীবী হোক।

—সম্পাদক

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ভ ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

মতামত

১

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ

"চতুরঙ্গ" মে ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র ও জনপ্রতিনিধিত্বের স্বরূপ" প্রবন্ধটির জন্য লেখক পুলকনারায়ণ ধর মহাশয়কে অভিনন্দন জানাই। জনপ্রতিনিধিত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠতা, জনমত প্রভৃতি সাড়ম্বরে ঘোষিত বিষয়গুলির প্রকৃত চরিত্র, অর্থবল আর বাহুবলের ভূমিকা—ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নে পুলকনারায়ণবাবুর বক্তব্য অত্যন্ত সঠিক, সময়োচিত, প্রয়োজনীয়। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি, প্রবন্ধটিকে পূর্ণতা-প্রাপ্তির সাফল্য থেকে বঞ্চিত করেছে বলে মনে হয়।

প্রথমত, একথা ঠিকই যে, 'ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা' সাধারণত সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ন্যূনতম 'গণতান্ত্রিক' প্রক্রিয়াগুলিকেও খর্ব করতে চায়; জনজীবনের উপর তুলনামূলক বিচারে অনেক বেশি নগ্ন, বল্গাহীন, ব্যাপক আক্রমণ ফ্যাসিবাদের এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই স্মরণে রাখা উচিত: সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও 'ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা'—এই 'দুই ব্যবস্থা'র মূল অর্থনৈতিক আদর্শ এক ও অভিন্ন—মূলধনবাদ বা ক্যাপিটালিজম; মূল শত্রু এক ও অভিন্ন—সাম্যবাদ বা কমিউনিজম; মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন—বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে বাঁচিয়ে রাখা। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফ্যাসিবাদের বিরোধী শক্তি—ইতিহাস এ সিদ্ধান্তে সায় দেয় না। বরং ইতিহাসের শিক্ষা হল: সংসদীয় গণতন্ত্রের জঠরেই ফ্যাসিবাদের উদয় ঘটেছে; সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমেই সে তার বর্বর পশুশক্তিকে সংহত করেছে। আর, 'গণতন্ত্র'র এই মাতৃরূপী ভূমিকার জন্যই, ১৯৩২ সালে, উল্লসিত গোয়েবল্‌স্‌কে নিভৃত সন্ধ্যায় বসে আমরা তাঁর রোজনামচায় লিখতে দেখেছি—'Elections! Elections! Direct to the people! We are all very happy.'[১]

'দুই ব্যবস্থা'র এই অভিন্নতার বিষয়টি অনুচ্চারিত থেকে গেছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

দ্বিতীয়ত, 'কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লি' মারফত ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে সংবিধান ছিল ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা রচিত 'ভারত সরকার আইন'-এরই বিকশিত রূপ। সামাজিক বাস্তবতার নানা ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধারগণ বিভিন্ন সময়ে উপলব্ধি করেন 'সংবিধান সংশোধন'-এর প্রয়োজনীয়তা—শাসক-গোষ্ঠীর শ্রেণী-স্বার্থে ই। এসব সাংবিধানিক পরিবর্তনের সাথে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিবর্তনের প্রশ্ন আদৌ জড়িত নয়; তাই, জড়িত নয় জনজীবনের মৌলিক স্বার্থরক্ষার বিষয়ও। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পরের বছরই যে কারণে 'অ্যাক্ট ফর দ্য বেটার গভর্নমেন্ট অব ইনডিয়া' ঘোষিত হয়, ১৯১৭ সালে অকটোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হয়ে পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে বাজার-হারানো-শঙ্কা সৃষ্টির দু বছরের মধ্যে ঠিক সেই কারণেই ভারতবর্ষে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের 'যুগান্তকারী ঘোষণা' বাস্তবায়িত হয় ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইনে। লক্ষ্য: 'গণতান্ত্রিক' পোশাকটি গায়ে চাপিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখা। তিরিশের দশকে এসে, সোভিয়েতে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের অব্যাহত বিজয় যখন সংসদীয় ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কেই সাম্রাজ্যবাদীদের দুশ্চিন্তিত করে তুলেছে, ব্রিটিশ রাজশক্তি যখন সংসদীয় পদ্ধতির লজ্জাজনক অচল অবস্থার ধাক্কায় গণতন্ত্রকে 'upto date' করার চিন্তায় আকুল[২], ঠিক সে সময়েই তাঁরা ভারতবর্ষের বুকে চালু করলেন 'ভারত সরকার আইন—১৯৩৫'। লাগাতার রাজনৈতিক প্রচারাঘাতের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে আমাদের ভুলতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, এই আইন মারফত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নীতি, নির্বাচিত বিধানসভার কাছে মন্ত্রীদের দায়বদ্ধতার নীতি—এইসব 'গণতান্ত্রিক' নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই উপহার দিয়েছিল ভারতীয় জনগণকে—চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থাটিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে ই। 'গণতন্ত্র' হয়ে উঠেছিল অগণতন্ত্রের জীয়নকাঠি। সংসদীয় গণতন্ত্রের/নির্বাচনী ব্যবস্থার মহিমা কীর্তনের যুগে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি লর্ড লোথিয়ানের সেই বিখ্যাত উক্তির পুনরুল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—'I believe the whole future of India now turns upon whether or not her young men and women throw themselves into the elections in order that they may assume responsibility for government, first in Provinces and then at the Centre.'[৩]

সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থার এই 'গণতান্ত্রিক' কৌশল সম্পর্কে নীরব থাকলে আলোচনা কিছুটা অপূর্ণ থেকে যায় বই কি।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত কোনো আলোচনায় এই ব্যবস্থার 'পবিত্রতা' ও 'বাঞ্ছনীয়তা' আজ প্রায় প্রশ্নহীন এক অমোঘ স্বতঃসিদ্ধের স্তরে উন্নীত। অথচ, আমেরিকায় বিশেষজ্ঞরা আজ আলোচনা করেন সংসদীয় রাজনীতির 'major industry'-তে রূপান্তরিত হওয়ার সমস্যা নিয়ে; এবং নির্বাচনী প্রচারে 'যত খুশি তত' অর্থ ব্যয় করার অধিকারের পরিণতিতে শুধুমাত্র ধনবান ব্যক্তিদের পক্ষেই রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যে সমস্যা, তাই নিয়ে।[৪] ব্রিটেনের পণ্ডিতমহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল—'Parliament is increasingly bypassed by big lobbies. Business interests "do not fight each other to get their men in Parliament. They seem to be content with a general situation which gives to business as a whole a stake."'[৫] জার্মানিতে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে এক সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ শ্রমিকই 'সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব' সম্পর্কে হয় উদাসীন অথবা বীতশ্রদ্ধ। ফ্রান্সে, সংসদীয় রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব হল—হৈচৈ করো, কিন্তু 'do not feel involved.'[৬] ইতালিতে, 'গণতন্ত্রের নগরদুর্গ-সংসদ' সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় যে সমালোচনার বন্যা লক্ষ করা যায়, নিঃসন্দেহেই তা সেদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বার্ধক্যজনিত জরাকেই সপ্রমাণিত করে।

অর্থাৎ, সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা এবং ক্রম-বর্ধমান অকার্যকর ভূমিকা—এটা শুধু ভারতীয় বাস্তবতা নয়, দুনিয়াজোড়া সমসাময়িকতারই এ এক জীবন্ত চালচিত্র। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' রাষ্ট্রিক-সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সংসদীয় গণতন্ত্রকে যতই মহিমান্বিত করার প্রচেষ্টা চালান না কেন, ইতিহাসের চাকাকে যে পিছনে ঘোরানো সম্ভব নয়—এই প্রতীতি ঘোষিত হওয়া আবশ্যিক ছিল আলোচ্য প্রবন্ধটিতে।

চতুর্থত, ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতা, তার নির্বাচনী ব্যবস্থার ফাঁকি, কাঞ্চনশক্তির অশুভ প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সেইসব মানুষ অনেক বেশি আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন যাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রের দৃঢ় প্রবক্তা। বিপরীতে, সাধারণ মানুষের কাছে এক সময়ে যাঁদের পরিচিতি ছিল 'বিপ্লবপন্থী', তাঁরাই হয়ে উঠেছেন/উঠছেন সংসদীয় গণতন্ত্রের শক্তিশালী

প্রচারক; তাঁদের আলোচনা থেকে এইসব প্রসঙ্গ দ্রুত অপসৃয়মাণ!

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে, ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল এবং স্বতন্ত্র পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী লিখলেন: 'ভারতীয় গণতন্ত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিবিদ্‌রা পার্টির দয়ার উপর নির্ভরশীল, আর পার্টিগুলি নির্ভরশীল অর্থ-জোগানদারদের মর্জির উপর; সাধারণ দরিদ্র মানুষের কোনো সুযোগ নেই।'[৭] জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থকও লেখেন: 'লোকসভাও সংবিধানের কিছু সংশোধন করতে পারে বটে কিন্তু মৌলিক সংশোধন করার অধিকার লোকসভার নেই।' 'গণতন্ত্রের ঘোমটাখানি খসিয়ে ফেলে একনায়কতন্ত্রের মুকুট মাথায় পরে' সরকার যে চলতে পারে, 'গণতন্ত্রের নামেই রাজতন্ত্র' চালানোর সুযোগ যে আছে, 'সংসদে লোকপ্রতিনিধিত্ব আইনের এমন সংশোধন পাস করিয়ে নেওয়া' যায় যার ফলে 'আগে যা ছিল দুর্নীতি' পরে তা হয়ে যাবে 'সুনীতি'—এসব স্বীকারোক্তিও জয়প্রকাশের লেখাতেই পরিস্ফুট।[৮] কিন্তু 'বিপ্লবপন্থী' নেতাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর নির্ভরতার প্রক্রিয়া ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আকার ধারণ করছে।

'অহিংস' নির্বাচনপদ্ধতি ক্রমবর্ধমান হারে সহিংস রূপ নিচ্ছে; 'সহিংস' পথের অনুগামীরা আরও বেশি-বেশি করে হয়ে উঠছেন অহিংস নির্বাচনের আদর্শে আস্থাশীল! এই মেরুপরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

সবশেষে, আলোচ্য প্রবন্ধের একটি তথ্যগত ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

রাজনৈতিক পর্যায়ে ভোট-বয়কটের আহ্বান 'সাতের দশকে সি. পি. আই. (এম-এল) পার্টির নেতৃত্বে' ওঠে নি। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বেশ কয়েকটি সংগঠন। তারই মধ্যে, 'সারা ভারত বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি' (AICCR) নামে যে বড়ো সংগঠনটি গঠিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ১৩ নভেম্বর, সেই সংগঠনটিই ১৯৬৮ সালের ১৪ মে পরিবর্তিত হয় 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটি'তে (AICCCR)। ওই ১৪ মে ১৯৬৮ তারিখেই এই কমিটি আহ্বান জানান—'নির্বাচন বয়কট করুন: শ্রেণীসংগ্রামের পথে অগ্রসর হোন।'[৯] দেড় মাস পর, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের আর-একটি গোষ্ঠী আহ্বান জানান—'লুটেরাদের পাতা নির্বাচনের ফাঁদে পা দেবেন না।'[১০] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভোট-বয়কট কেন প্রয়োজন—সেই কারণ বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে যে-সকল প্রধান-প্রধান লেখা সে সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেসব রচনাও ১৯৬৭-৬৮ সালেই সৃষ্টি।

সি. পি. আই. (এম-এল) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২২ এপ্রিল, ১৯৬৯।

সূত্রাবলী:

১. *The Rise and Fall of the Third Reich*: William L. Shirer, Fawcett Crest, New York, 1983, p 230.

২. *Britain's Political Future*: Lord Allen of Hurtwood, Longman, Green and Co., London, 1934, pp 1-2.

৩. *In the Shadow of the Mahatma*: G. D. Birla, Orient Longmans Ltd., Calcutta, 1953, p 198.

৪. *Financing Politics*: *Money, Elections and Political Reform*: Herbert Alexander, Congressional Quarterly Press, 1976, pp 16, 58.

৫. *Western Capitalism Since The War*: Michael Kidron, Penguin, 1970, p 108.

৬. ওই, p 109.

৭. *Rescue Democracy From Money-Power*: C. Rajagopalachari, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1977, p 27.

৮. দেশবাসীদের প্রতি পত্র, জয়প্রকাশ নারায়ণ, সমাজবাদী যুব জনসভা পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৬, পৃ ৩৩, ৭১।

৯. দেশব্রতী, ২৩শে মে, ১৯৬৮, পৃ ১।

১০. ভিত্তি, ৭ জুলাই, ১৯৬৮, পৃ ১।

দীপক পিপলাই
৭৫/৩০, এস. এন. রায় রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩৮

২

প্রসঙ্গ রামমোহনের মূল্যায়ন
গ্রন্থসমালোচকের জবাব

"চতুরঙ্গ"র ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সংখ্যায় গ্রন্থ-সমালোচনা পর্যায়ে শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্তীর "বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন" গ্রন্থটির যে সমালোচনা আমি করেছিলাম, তাতে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীনরেন সরকার মূল গ্রন্থটি (যেটি আগে তাঁর পড়া ছিল না) পড়েছেন, সমালোচনাটিকে 'প্রেরণাসঞ্চারকারী' বলেছেন, এবং সমালোচনাটির বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত লিখে জানিয়েছেন।

পত্রলেখক দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, গ্রন্থটির দুটি অধ্যায়ের বক্তব্যসার হিসাবে আমি যা বলেছি তা গ্রন্থটির বক্তব্যসার নয়। তাতে নাকি গ্রন্থকারের বক্তব্য একপেশে আর বিকৃত ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি আরো অভিযোগ করেছেন, ভূমিকায় লেখক গ্রন্থরচনার যে উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন তা নিয়ে আমি একটি বাক্যও ব্যয় করি নি। এর উত্তরে পত্রলেখককে সবিনয়ে জানিয়ে দিতে চাই: ভূমিকা-ও উপসংহার-মূলক বক্তব্যে লেখক কী বলেছেন, কেবল তার উপর ভিত্তি করে কোনো সমালোচনা আমি করি নি। পাঠক লক্ষ করলে দেখবেন, পত্রলেখকের দুটি উদ্ধৃতিই উপসংহার থেকে নেওয়া। উপসংহার গ্রন্থের বক্তব্যসার নয়। ভূমিকা সম্পর্কেও একই কথা। লেখকের প্রারম্ভিক ঘোষিত উদ্দেশ্য অনেক কিছু হতে পারে। আমি আগে-পরের ব্যাপারটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে মূল গ্রন্থে লেখক কার্যত কী বলেছেন তারই বক্তব্যসার তুলে দিয়েছি বা তারই সমালোচনা করেছি। মনোযোগী পাঠক মূলগ্রন্থ আর সমালোচনা পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লে আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য বুঝতে পারবেন।

'দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের মাপকাঠি'র প্রসঙ্গে পত্র-লেখক এক গুরুতর অভিযোগ এনেছেন—মূল্যায়নের মাপকাঠি নিয়ে শ্রীচক্রবর্তী-উপস্থাপিত তত্ত্বের বিরোধিতা বা সমর্থন কোনোটাই আমি করি নি। এ অভিযোগ সত্যি। তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের নিজস্ব। সেক্ষেত্রে লেখক আর পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিগত অভিমুখ এক হতে পারে, না হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থ-সমালোচককে বোধহয় একটু ভিন্নতর অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। তত্ত্বমূলক বক্তব্য পরিবেশন করার আকাডেমিক ডেমোক্র্যাসি স্বীকার করে গ্রন্থ-সমালোচক হিসাবে আমি কোনো ভুল করেছি বলে মনে করি না। এ ছাড়া, আমি কী করতে পারতাম? গ্রন্থসমালোচনাকে আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামতের আদালতে পরিণত করতে পারতাম। সেই ক্লান্তিকর অথচ উত্তেজক কাজটি আমি করি নি মূলত যে কারণে সেটাও বলি। শ্রী চক্রবর্তী যে নস্যাৎমূলক দর্শনটি এখানে খাড়া করেছেন সেটি নতুন কিছু নয়। উনিশ শতক আর তার প্রাণপুরুষদের নিয়ে এই চাপান-উতোর শুরু হয়েছে চল্লিশের দশক থেকে। এই নস্যাৎমূলক দর্শনটি ক্লাইমেক্সে ওঠে সত্তরের দশকে। এর বিরুদ্ধ বক্তব্যগুলিও প্রায় সব বলা হয়ে গেছে। আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে দুরকম মতামতই মুখোমুখি সহাবস্থান করছে। উনিশ শতক নিয়ে যে তাত্ত্বিক

লড়াই আগেই হয়ে গেছে, গ্রন্থকার সেটিকে পুনর্জীবিত করেছেন—এইমাত্র। লেখক প্রকারান্তরে সে কথা স্বীকারও করেছেন। মূর্তিভাঙা আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'ঔপনিবেশিক দেশে ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বিরোধিতা করাটাই কোনো আন্দোলনের বা ব্যক্তির প্রগতিশীলতা বিচারের মূল মাপকাঠি।' এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আকাডেমিক স্তরে বক্তব্যের একটি ধারা যে বর্তমান, পত্রলেখকও তো সে সম্পর্কে সচেতন আছেন—বিনয় ঘোষ, বরুণ দে, সুমিত সরকার, অরবিন্দ পোদ্দার প্রমুখের তীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলি তিনি উদ্ধার করেছেন।

প্রত্যেক গ্রন্থেরই একটা মূল দাবি থাকে। পত্রলেখক মনে করতে পারেন এই গ্রন্থের মূল দাবি গ্রন্থকারের উপস্থাপিত তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গি। আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি, এই গ্রন্থের মূল দাবি এই—সত্তরের দশকে মূর্তিভাঙা আন্দোলনের মাপকাঠিটি সঠিক হলেও আন্দোলনটি ছিল, গ্রন্থকারের ভাষায়, 'পদ্ধতিগত ভাবে ভুল, প্রস্তুতিবিহীন ও শিশুসুলভ বিশ্বআবার পরিচায়ক' (পৃ ১১)। সুতরাং গ্রন্থকার মূল্যায়নের সেই মাপকাঠিটিকে নিয়ে পদ্ধতিগত ভাবে সঠিক, প্রস্তুতিসমৃদ্ধ, পরিণত ও সুশৃঙ্খল একটি প্রয়োগগত প্রতিষ্ঠা দিতে চান। গ্রন্থসমালোচক হিসাবে গ্রন্থকারের তত্ত্ব কোন্ ধারার অনুসারী, শুধুমাত্র সেইটুকু বলে আমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছি 'মূল্যায়নের সঠিক মাপকাঠি'টিকে যেখানে তিনি প্রয়োগ করেছেন সেইখানে। নাকচমূলক বক্তব্যকে লেখক কতটা প্রামাণিক ও শক্তপোক্ত ভিত্তি দান করতে পেরেছেন, সেইটাই তো আসল জায়গা। 'উপলক্ষ ও আসল বস্তু' পর্যায়ে পত্রলেখক অভিযোগ করেছেন আমি নাকি মূল প্রশ্ন এড়িয়ে নির্মীয়মাণ বাড়ির প্লাস্টারিং রঙ ইত্যাদি বহিরঙ্গের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। তিনি লিখেছেন, তিনি বুঝতে পারেন নি চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে আমি কীসের সমালোচনা করেছি। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি পত্রলেখক উপলক্ষকে আসল আর আসলকে উপলক্ষ বলে কেন চালাতে চাইছেন। গ্রন্থকার তাঁর নেতিবাচক দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কঠিন চেষ্টায় যেসব তথ্যপ্রমাণ হাজির করেছিলেন, ইতিহাসের আদালতে সেগুলির অধিকাংশ জাল প্রমাণিত হওয়ায় হয়তো গ্রন্থকারের সহমত-পোষণকারী পাঠক হিসাবে পত্রলেখক বিপর্যস্ত বোধ করছেন। তাই আমার উত্থাপিত ঐতিহাসিক ও প্রমাণসিদ্ধ তথ্যগুলির বিরুদ্ধে পালটা তথ্য আনার ব্যর্থ চেষ্টা না করে তার গায়ে উপলক্ষের লেবেল এঁটে দেবার চেষ্টা করছেন।

চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে আমি কী করেছি, তা "চতুরঙ্গ"র পাঠকের অগোচর নেই। তথাপি প্রশ্নটা যখন পত্রলেখক তুলেছেন তখন দু-চার কথায় তা সরল করে বলে দিই।

গ্রন্থটির দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় 'বাংলার রেনেসাঁস'। দ্বিতীয় অধ্যায়টির আলোচ্য 'প্রসঙ্গ : রামমোহন'। বাঙলার রেনেসাঁস যে কিছুই নয়—এটা দেখানোর জন্য গ্রন্থকার ইউরোপীয় রেনেসাঁসের একটি মডেল স্থাপন করেছেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সেই প্রগতিশীল মডেলটির ভিত্তিতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের হতকুচ্ছিত চেহারাটি। আমি দেখিয়েছি ইউরোপীয় (ইতালীয়) রেনেসাঁসের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে গ্রন্থকারের কোনো ধারণা নেই। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয়লগ্নে উঠতি বুর্জোয়ারা যে রেনেসাঁস সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল তার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল; প্রগতিশীলতার দিক তো ছিলই। সে রেনেসাঁস ইতালির রাজনৈতিক ভাগ্য আর সাধারণ মানুষের ভাগ্যকে পালটাতে পারে নি। খোদ ইতালীয় রেনেসাঁসে যেসব লক্ষণ ছিল না, সে লক্ষণ বঙ্গীয় রেনেসাঁসে কেন নেই বলে উত্তেজিত আলোচনাটি অর্থহীন। গ্রন্থকার যে ভিত্তির উপর বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সন্ত্যাৎমূলক প্রাসাদ গেঁথেছেন, সেই ভিত্তিটিকে আমি সরিয়ে দিয়েছি। ভিত্তি যদি সরে যায় প্রাসাদটি থাকে কী করে? পত্রলেখক

অভিযোগ করেছেন : আমি মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গেছি। তাঁকে সবিনয়ে জানাই : মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন গ্রন্থকার। আমি মূল প্রশ্নটা তুলেছি। ইতালীয় রেনেসাঁস কাদের সংস্কৃতি ছিল, এবং কোন্ কোন্ দিক থেকে তা প্রগতিশীল ছিল তা ব্যাখ্যা করুন—তাহলেই বঙ্গীয় রেনেসাঁসেরও একটা অবয়ব দেখতে পাবেন। নগরকেন্দ্রিক বুর্জোয়া সংস্কৃতি আবার কবে কোথায় সর্বজনের জন্য মুক্তির বার্তা নিয়ে আসে? ইতালীয় রেনেসাঁস কি প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব ছিল? যেসব মৌলিক ত্রুটির ভিত্তিতে বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে নস্যাৎ করার চেষ্টা হয় বা হয়েছে, সে ত্রুটি ইতালীয় রেনেসাঁসে ছিল। পত্রলেখক এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন নি।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায় রামমোহনকে নিয়ে। শ্রেণীগত পরিচয়ে জমিদার আর ব্যবসায়ী হওয়ায় রামমোহন সারাজীবন চালিত হয়েছিলেন সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে ব্রিটিশ শাসকদের সচেতন সেবাদাস হিসাবে—এই তত্ত্বটিকে প্রমাণ করার জন্য গ্রন্থকার নেমেছেন ইতিহাসের অঙ্গনে। ইতিহাস ঘেঁটে তিনি রামমোহনের জীবন আর তাঁর আপাত বিখ্যাত কাজকর্মের তথ্যপ্রমাণ একের পর এক এনে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন তাঁর সত্যকার স্বরূপটি। পড়তে-পড়তে গ্রন্থকারের বৈপ্লবিক ইতিহাসচেতনার পরিচয় পেয়ে আমি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। রাজনৈতিক মতাদর্শের আদালতে গ্রন্থটিকে আনতে আমি অনিচ্ছুক ছিলাম বটে, তবে গ্রন্থটিকে ইতিহাসের আদালতে না এনে পারি নি। তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে একজন তাত্ত্বিকের যা খুশি তত্ত্ব উপস্থাপিত করার স্বাধীনতা আছে। তার মানে এই নয় যে, ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করার অধিকারও তাঁর থাকবে। মৃত, বিকৃত, অর্ধসত্য, পরিত্যক্ত, অপ্রমাণিত ও স্বকপোলকল্পিত তথ্যগুলি একের পর এক সাজিয়ে গ্রন্থকার আমাদের মুগ্ধ করে দেবেন আর সেগুলির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা অসত্যতার উদ্‌ঘাটন করা চলবে না! ইতিহাস কোনো গালগল্প নয়—তথ্যপ্রমাণের খুঁটিনাটি সেখানে থাকবেই। আমি আমার সীমাবদ্ধ সামর্থ্য অনুসারে দেখিয়েছি—গ্রন্থকার তাঁর তথ্যপ্রমাণগুলি যে-যে উৎস থেকে নিয়েছেন সেসব উৎসসূত্রের গবেষণাধর্মী মূল্য বা প্রামাণিকতা এখন আর নেই। মূল উৎসসূত্র বা আলোচনাগ্রন্থ থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রসঙ্গবিচ্যুত বা বিকৃত তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর তথ্যনির্বাচনের মাপকাঠিটি কী? গ্রন্থকার কোন্ উৎসসূত্র থেকে কতটা গ্রহণ করবেন, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি দেখিয়েছি নেতিবাচক তথ্য ছাড়া কোনো উৎস থেকেই তিনি কিছু নেন নি। ইতিবাচক প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলিকে সর্বক্ষেত্রে তিনি এড়িয়ে গেছেন। তথ্যের প্রামাণিকতা অপ্রামাণিকতা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। পত্রলেখকের মতে, এসব নাকি বাহ্যিক ব্যাপার—আসল হচ্ছে তত্ত্ব। যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সত্য ইতিহাসের পথ বর্জন ক'রে মৃত, বিকৃত, অপ্রমাণিত ও স্বকপোলকল্পিত ইতিহাস রচনা করতে হয়, সে তত্ত্বের গোড়ায় যে কোনো বড়ো রকমের গলদ আছে এটা কি বলার দরকার আছে? আমার উপস্থাপিত তথ্যপ্রমাণগুলি সম্পর্কে পত্রলেখক তথ্যগতভাবে কিছু বলেন নি।

ব্যাপার যা দাঁড়াল তা এইরকম—গ্রন্থটির দু-কামরার বৈপ্লবিক প্রাসাদটির প্রথম কামরার তলা থেকে সরে গেল ভিত্তি, আর দ্বিতীয় কামরার মাথা থেকে উড়ে গেল ছাদ, আর দেওয়ালগুলিতে ধরে গেল মারাত্মক ফাটল। পত্রলেখক এবার কি বুঝতে পেরেছেন চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে সমালোচনায় আমি কী করেছি? পত্রলেখক আমার উপস্থাপিত রেনেসাঁস (ইতালীয়) বিষয়ক বক্তব্য ও রামমোহন সম্পর্কে উপস্থাপিত ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ সম্পর্কে তথ্যগত ভাবে প্রায় কিছু না বলে সমালোচনাটির বিরুদ্ধে কিছু খুচরো অভিযোগ এনেছেন। খুচরো অভিযোগগুলি এই—

(১) অবান্তরভাবে কেন ইউরোপীয় রেনেসাঁস-নায়কদের ভোগবিলাস-পূর্ণ জীবনের কথা এনেছি?

(২) শ্রী চক্রবর্তীর মতো আরো অনেক বাঘা-বাঘা রেনেসাঁস-ভাষ্যকার বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে নস্যাৎ করেছেন। কেন সেসব কথা চেপে গেছি? (৩) সুশোভন সরকারের ত্রিসূত্রিক সংযোজনী কেন ভাসাভাসাভাবে ছুঁয়ে গেছি? (৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও রেনেসাঁস যে একই বিষয়ের এদিক ওদিক, এ সত্যটি কেন আমার উপলব্ধিতে ধরা পড়ে নি? (৫) রামমোহনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার উপাদান খোঁজায় কেন আমার আপত্তি? (৬) রামমোহনের মুসলিমবিদ্বেষের প্রমাণ Appeal to the King in the Council-এর ৩নং অনুচ্ছেদে ছিল, অথচ কেন অসততার পরিচয় দিয়ে সেটা উদ্ধার করি নি? (৭) শ্রী চক্রবর্তী ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'মূল দৃষ্টি-ভঙ্গির ক্ষেত্রে দুজনের আকাশপাতাল তফাত'। সেটা কেন বুঝতে পারি নি? (৮) সতীদাহপ্রথার বিরোধিতার ক্ষেত্রে গ্রন্থকার রামমোহনকে 'পথিকৃৎ' এবং 'আন্দোলনের গতিবেগ সঞ্চার' করেছেন বলে মনে করেছেন, অথচ আমি কেন ইচ্ছাকৃত অসততার অভিযোগ এনেছি?

যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।

(১) রামমোহনের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনের প্রতি গ্রন্থকারের কটাক্ষের উত্তরে ইউরোপীয় রেনেসাঁস নায়কদের অ্যারিস্টোক্র্যাটিক জীবনের কথা এনেছি। বাঙলার রেনেসাঁসকে তুচ্ছ করার জন্য ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মডেল আনা যদি অবান্তর না হয় তাহলে···

(২) উক্ত রেনেসাঁস-ভাষ্যকারদের গ্রন্থসমালোচনা এটি নয় বলে।

(৩) প্রলেতারীয় বিপ্লবের লক্ষণ বুর্জোয়াদের দ্বারা সংঘটিত রেনেসাঁসে থাকা সম্ভব নয় বলে।

(৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে বাঙলার রেনেসাঁস-নায়করা খাঁটি বুর্জোয়ায় পরিণত হতে পারে নি, তারা জমিদার হয়ে গিয়েছিল, অতএব এ রেনেসাঁস অচ্ছুত—এই ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। ইতালীয় রেনেসাঁসে বুর্জোয়ারা কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা আর অর্থনীতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চলেছিল। তাতে সে রেনেসাঁস অচ্ছুত হয় নি। তথ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার জায়গা এটা নয়—সেজন্যে এর বেশি কিছু বলতে পারছি না।

(৫) রামমোহনে জাতীয়তাবাদের উপাদান খোঁজায় আমার খুব আপত্তি নেই। মূল আপত্তি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার উপাদান খোঁজায়। কেন? উত্তরটা অমল ঘোষের "মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর" গ্রন্থের ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় আছে। একটু দেখে নেবেন। আমি যৎসামান্য উদ্ধার করছি: 'যাঁরা লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ গ্রন্থখানি পাঠ করেছেন (এমনকি যাঁরা করেন নি), সবাই জানেন যে মার্কসবাদী সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে, এবং তা হল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়। লেনিন দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ভাবে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় ১৯০০ সাল নাগাদ।' ···রামমোহন মারা গেছেন কত সালে?

(৬) অঙ্কের হস্তিদর্শনের গল্পটি নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। হাতি কান কুলোর মতো। তার মানে এই নয় হাতি কুলোর মতো।

(৭) মূল দৃষ্টিভঙ্গি যদি এতই আলাদা, তাহলে গ্রন্থকার এই গোপন আঁতাত করলেন কেন?

(৮) প্রাসঙ্গিক অংশটা পড়ে দেখুন: লেখা আছে 'কাজেই এ বিষয়ে পথিকৃৎ-এর স্বীকৃতি রামমোহনের প্রাপ্য নয়' (পৃ ৬২)। শ্রী চক্রবর্তী 'ফেয়ার প্লে' খেলতে অভ্যস্ত নন তাই 'সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে গতিবেগ দিয়েছিলেন' বলে পেরিয়ে যাবার সময় একটা 'ট্যাকল' করতে ভোলেন নি।··· 'যদিও এর আগে লর্ড বেনটিঙ্ককে তিনি অজ্ঞাত কারণে (পাছে ব্রিটিশ-শাসকেরা এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিপুলসংখ্যক হিন্দুদের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়েন, এই আশঙ্কাতেই কি?) এই আইন প্রণয়ন না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন' (পৃ ৬২)। সত্যি তো, এত

প্রশংসা আমি কেন চেপে গেলুম?

পত্রলেখক ধরে নিয়েছেন দু-চারটি খুচরো অভিযোগ দিয়ে আমার উপস্থাপিত বক্তব্য আর ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণকে নাকচ করা যাবে না। সেজন্য আমার বক্তব্য ও তথ্যপ্রমাণের গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য তার গায়ে দুটি সস্তা ও হাস্যকর লেবেল এঁটে দিতে চেয়েছেন। একনম্বর লেবেলের নাম—এটা আসল বস্তু নহে, উপলক্ষ। এতে যদি কাজ না হয় শেষে আর-একটি লেবেল এনেছেন 'উহ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও স্বীকৃত ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ভাড়াটে ঐতিহাসিক-দের অভিভাবকত্ব মেনে' এই গ্রন্থসমালোচনা সম্পন্ন হয়েছে—অতএব প্রগতিশীল পাঠক এই সমালোচনা মুখে তুলবেন না।'

পত্রলেখক গ্রন্থকারের সঙ্গে সর্ব ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন দেখে বিনীতভাবে একটি প্রশ্ন রাখি: তিনি কি মনে করেন মার্কসবাদ চরিত্রহননকারী মিথ্যাশ্রয়ী একটি বিদ্যা?

আমি মনে করি, মার্কসবাদ কোনো একচক্ষু হরিণ নয়। ইতিহাসের অগ্রগতির একটা ধারা আছে। সেই ধারার প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে মার্কসবাদের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন আছে। সংকীর্ণতাবোধের কারণে অনেক সময় সমাজপ্রগতির সেই ধারা বা ধাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা উপেক্ষা জন্মে। শ্রী চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। দু-ভাগে ভাঙা আমাদের সমাজবিন্যাসের একটা স্তরে (কৃষকবিক্ষোভের দিক থেকে) তিতুমীরের যেমন একটা বিদ্রোহী ভূমিকা আছে, তেমনি সমাজবিন্যাসের অন্য স্তরে (বুর্জোয়া জাগরণের দিক থেকে) ডিরোজিও-র বৈপ্লবিক ভূমিকাও তো ঐতিহাসিক। মার্কসবাদ কি বলে একটিকে স্বীকার করে অন্যটিকে নস্যাৎ করতে? রেনেসাঁস নিয়ে আলোচনা চলছে। মার্কসবাদ কি কোথাও বলেছে—বুর্জোয়াদের দ্বারা সংঘটিত রেনেসাঁসের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের জাগরণ আর মুক্তির লক্ষণগুলিও ছিল? বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। আমি এঙ্গেলসের একটা বক্তব্য তুলে দিচ্ছি। "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"র ১ম ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১. ২. ১৮৯৩) দান্তে সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন, 'ধনতন্ত্রের অতীতের বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রতি "কমিউনিস্ট ইশতাহার" পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। প্রথম ধনতন্ত্রী দেশ ইতালি। সামন্ততন্ত্রী মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের প্রারম্ভকাল এক অসাধারণ বিরাট মানুষের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। তিনি হলেন দান্তে; একাধারে তিনি ছিলেন মধ্য-যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি। আজ এক নতুন ঐতিহাসিক যুগ বিকশিত হচ্ছে। ইতালি কি দেবে একজন নতুন 'দান্তে' যিনি প্রলে-তারীয় যুগের জন্মকাল চিহ্নিত করবেন?' ধনতান্ত্রিক যুগের উদয়পর্বে দান্তের আধুনিকতাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে এঙ্গেলস প্রলেতারীয় যুগের নতুন 'দান্তে' অর্থাৎ প্রলেতারীয় সংস্কৃতির জন্য ব্যক্ত করেছেন তীব্র প্রত্যাশা। এঙ্গেলস কি জানতেন না দান্তের শ্রেণী-পরিচয়? ইতালির তাৎকালিক রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা বা ইতালির প্রলেতারিয়েতদের দুঃসহ অবস্থা সম্পর্কে এঙ্গেলস কি অ-সচেতন ছিলেন? শ্রী চক্রবর্তীর এই গ্রন্থটি হাতে পড়লে এঙ্গেলস কী বলতেন জানি না, তবে এইজাতীয় নস্যাৎমূলক একটি গ্রন্থ পাঠ করে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, সেটির কথা বলতে পারি—রডারিক বেনেডিক্স নামে এক অতিবিপ্লবী সমালোচক শেকসপিয়রকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করে একটি বই লিখেছিলেন। সেটি পাঠ করে এঙ্গেলস মার্কসকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

'সেই নচ্ছার রডারিক বেনেডিক্স 'শেকসপিয়র বাতিকে'র বিরুদ্ধে একটা মোটা বই লিখে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেছেন। সেই বইয়ে তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আমাদের বড়ো কবিদের সঙ্গে শেকসপিয়রের কোনো তুলনাই হয় না। শেকসপিয়রকে তাঁর আসন থেকে নামিয়ে আনতে হবে এবং সেখানে স্থাপন করতে হবে বলীবর্দ আর বেনেডিক্সের সিংহাসন।'

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৬১

৩

প্রসঙ্গ সংরক্ষণ-নীতি

"চতুরঙ্গ" পত্রিকার এপ্রিল ১৯৯১ সংখ্যায় সংরক্ষণ বিষয়ে শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন প্রসঙ্গে সবিনয়ে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

শ্রী মুখোপাধ্যায় সম্ভবত অনিচ্ছাকৃতভাবেই কিছু বিতর্কিত তথ্য পরিবেশন করেছেন। যথা, সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনে বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীরা আত্মাহুতি দেন, বি. জে. পি.-র অযোধ্যা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় তাই সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে, সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, অনেক ছাত্রের গায়ে জোর করে আগুন লাগানো হয় এবং বহু ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণভুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কৌশলে অন্য কারণে আত্ম-ঘাতী ছাত্রছাত্রীদের নাম সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন-কারীর তালিকাভুক্ত করা হয়—এমন অভিযোগও উঠেছে! আর, বি. জে. পি.-র অযোধ্যা আন্দোলনের জন্যে নয়, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার অতিরিক্ত ৫-১০ শতাংশ চাকরি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় সংরক্ষণের সংবিধান-নির্দেশিত মাত্রা অতিক্রান্ত হয়েছে অভিযোগ তুলে উচ্চবর্ণের কিছু লোক আদালতের শরণাপন্ন হন এবং আদালত এ ব্যাপারে স্থগিতাদেশ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে—এর সাথে অযোধ্যা-কেন্দ্রিক আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তা ছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলি দেশের সমস্যা-সমাধানে যথার্থই আগ্রহী নন, তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগান এবং জনতা দলও ভোট কুড়োনোর লক্ষ্য নিয়ে সংরক্ষণ-নীতিকে হাতিয়ার করেছে। এ ধরনের অভিযোগও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এই কারণে—জনতা দল সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের চিরাচরিত রাজপুত ভোট হারানোর প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছিল—এই দলের দুই শীর্ষনেতা ভি. পি. ও চন্দ্রশেখর দুজনেই রাজপুত হওয়ায় জনতা দল সংগঠিত রাজপুত ভোটের বড়ো দাবিদার ছিল একথা সবাই জানেন। অতীতে কোনো রাজনৈতিক দলই উচ্চবর্ণের সমর্থন হারানোর ঝুঁকি নেয় নি বলেই কালেলকর কমিশন ও মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট বছরের পর বছর হিমঘরে বন্দী ছিল। অমলবাবু যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাবতীয় রাজনৈতিক দলের মূল্যায়ন করেছেন, সেভাবে বিচার করলে কোনো সরকারই সুবিচার পাবেন না, কারণ সরকার যা-ই করুক বিরোধীরা বলবেই, ভোটের স্বার্থে কাজটা করা হয়েছে—এভাবে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হলে সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা সম্পর্কে সংশয় থাকবেই।

মুসলমান এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়েও অনগ্রসরতার লক্ষণ খুব স্পষ্ট এবং সংখ্যালঘুদের আর্থিক অনগ্রসরতা যে 'তফশিলি জাতি ও উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর তুলনায় কিছু কম নয়'—অমলবাবুর এই বক্তব্য ঐতিহাসিক বিচারে সত্য, এবং সর্বাংশে তথ্য-নির্ভর। সেজন্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার যে মুসলমান ও খ্রীষ্টান অনগ্রসরদেরও সংরক্ষণের আওতায় এনেছিলেন, একথা উল্লেখ করতে অমলবাবু সম্ভবত বিস্মৃত হয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি এও বিস্মৃত হয়েছেন যে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সর্বস্তরের আর্থিক অনগ্রসরদের জন্যও মোর্চা সরকার ২৭ শতাংশের অতিরিক্ত ৫-১০ শতাংশ সরকারি চাকরি সংরক্ষণের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন, যার ফলে মণ্ডল কমিশন-বিরোধীদের আদালতের ইনজাংশন পেতে সুবিধে হয়েছিল। যদি তাঁদের আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের জন্য চাকরির সংরক্ষণের দাবি আন্তরিক হত তাহলে তাঁরা কখনোই মোর্চা সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পরেই আদালতের স্থগিতাদেশ প্রার্থনা করতেন না। এর ফলে সরকারের দুর্বলতাও স্পষ্ট হয়েছে, কারণ মণ্ডল কমিশনের যে রিপোর্টের ভিত্তিতে

সরকার অন্যান্য অনগ্রসর জাতি অর্থাৎ OBC-র জন্য সরকারি চাকরির ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ করেন, সেই রিপোর্টের অন্যতম প্রধান মানদণ্ডই ছিল আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন। যেসব জাতি বা বর্ণের পরিবার-পিছু সম্পত্তির গড় মূল্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গড় মূল্যের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম, যেসব শ্রেণী ও বর্ণভুক্ত মানুষ রাজ্য-স্তরের গড় হিসাবের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি ক্ষেত্রে মাটির ঘরে থাকেন, যেসব বর্ণ বা শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ পরিবারের অবস্থান পানীয় জলের উৎস থেকে আধ কিলোমিটার বা তারও দূরে, এবং যেসব বর্ণ বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গড় সংখ্যা যা, তার তুলনায় কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বেশি পরিবার খোরাকি ঋণ নিয়েছে, তাদেরই মণ্ডল কমিশনের অনগ্রসরতা-বিচারের আওতায় আনা হয়েছিল। অথচ যাঁরা জাতভিত্তিক সংরক্ষণের পরিবর্তে আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণের দাবিতে সোচ্চার, তাঁরা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেন না যে, মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট রচনার প্রধান শর্তই ছিল আর্থিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীগুলিকে চিহ্নিত করা। সরকারও চাপের মুখে শুধুমাত্র আর্থিক বিচারে দুর্বলতর মানুষের জন্য অতিরিক্ত সংরক্ষণের প্রস্তাব করে মণ্ডল-বিরোধীদের অযৌক্তিক উন্মাদনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তবে অমলবাবুর এই অভিযোগের মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে যে, সমাজের উচ্চবর্ণও দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত নয় আর সেই কারণেই শুধু উচ্চবর্ণ বলে নয়, ব্রাহ্মণ শ্রেণীর একাংশও যে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে অনগ্রসর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন, এবং মোর্চা-সরকার যে তাঁদেরও সংরক্ষণের আওতায় এনেছিলেন, শ্রী মুখোপাধ্যায় সে বিষয়েও কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি।

অমলবাবুর আরেকটি অভিযোগ, 'সংবিধান প্রবর্তনের পর থেকে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য যে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা এযাবৎ কার্যকর আছে, তাতে প্রকৃত কাজের কাজ কিছু হয়নি'—এও মণ্ডল-বিরোধী আন্দোলনের একটি অজুহাত। কিন্তু সরকারি পরিসংখ্যানেই প্রমাণিত, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও সরকারি চাকরির মাত্র ১৮·৭২ শতাংশ তপসিলি জাতি-উপজাতি-অধিকৃত, যেখানে তাদের জন্য ২২·৫ শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত আছে। তা-ও আবার প্রথম শ্রেণীর চাকরির মাত্র ৫·৬৮ শতাংশ তপসিলি জাতি-উপজাতির লোকজন পেয়েছেন—অর্থাৎ, যেসব বিভাগীয় সচিব ও পদস্থ আমলাদের হাতে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য রচিত প্রকল্প কার্যকর করার দায়িত্ব সমর্পিত, তাঁদের প্রায় সকলেই উচ্চবর্ণের সন্তান। এই শ্রেণীর লোকের কাছে কিভাবে আশা করা যায় যে, তাঁরা দরদের সঙ্গে অনুন্নত জাতির জন্য বরাদ্দ অর্থের সঠিক ব্যবহার করবেন বা তাঁদের জন্য বৃত্তি বা শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবেন? ভারতের বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ভি. পি. সিং কজন হতে পারেন, যিনি নিজে উচ্চবর্ণের মানুষ হয়েও এবং রাজপুতপ্রধান লোকসভাকেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করলেও মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করার মতো ঝুঁকি নেবেন? চন্দ্রশেখরের মতো মানুষই বা কজন, যিনি উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত-গ্রামবাসী হয়েও জাতপাতের বেড়া টপকাতে নামের সঙ্গে নিজের পদবী উল্লেখ করেন না এবং নিজে উচ্চবর্ণভুক্ত রাজপুত হয়েও মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দলীয় নির্বাচনী ইস্তাহারের অন্তর্ভুক্ত করতে সাহসী হন? অমলবাবু বুদ্ধিজীবীদের চিরাচরিত অভ্যেস অনুযায়ী আমলাতন্ত্রের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কেবলই রাজনীতিক-দের দুষতে থাকলেও বাস্তবে সরকারি প্রকল্প কার্যকর করার দায়িত্ব আমলাদের। রাজনীতিকরা নীতি নির্ধারণ করেন, কিন্তু সরকারি অফিসারদের কাজ হল সেই-সব নীতির বাস্তবায়ন। অমলবাবুর এই বক্তব্যের মধ্যে অবশ্যই সত্যতা আছে যে, পারিবারিক দারিদ্র্যের চাপে অধিকাংশ তপসিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত মানুষ শৈশবেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে তাঁদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই সংরক্ষণের সুফল ভোগ করেন;

কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ঘটনা যে, যতদিন না পর্যন্ত প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে সরকারি আমলাদের মধ্যে তাঁরা গরিষ্ঠতা অর্জন না করতে পারছেন, ততদিন সরকারি পরিকল্পনার সুফল অনুন্নত শ্রেণীর হাতে পৌঁছাবে না; উচ্চবর্ণের মানুষ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত রাখার চেষ্টা করবে। এই জাতগত প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গে বসে বোঝা যাবে না—দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই জাতপাতের বিচার আমাদের চেয়ে অনেক তীব্র, কেন্দ্রীয় প্রশাসনে তো কথাই নেই! তবে অনুন্নত সম্প্রদায়কে বৃত্তির ক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্য দেবার যে প্রস্তাব অমলবাবু দিয়েছেন, তা উচ্চবর্ণের উপযুক্ত পরামর্শ। হাজার বছর আগেও উচ্চবর্ণের মানুষ, বিশেষত ব্রাহ্মণ্য মানসিকতা, এইভাবেই তথাকথিত নীচুজাতের মানুষদের জাতিগত বৃত্তিকে উৎসাহিত করত, যাতে তারা কখনও শিক্ষা বা রাজ্য-শাসনের পথে পা না বাড়াতে পারে। কামার বংশ-পরম্পরায় লোহার কাজ করবে, কুমোর মাটির পাত্র গড়বে, চাষি চাষ করবে, পটুয়া মূর্তি তৈরি করবে আর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা এইসব মানুষের মাথায় চড়ে অবাধে শোষণ চালিয়ে যাবে—এটাই ছিল তাঁদের স্বকপোলকল্পিত 'বিধির বিধান'! শ্রী মুখোপাধ্যায়ও চাইছেন, সরকার প্রশাসনে চাকরির সংরক্ষণ না রেখে অনগ্রসর জাতির পেশাগত জীবনের উন্নয়নে সাহায্য করুক—এই ধরনের প্রস্তাবের মধ্যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-বাদের ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার চিরন্তন কামনার প্রচ্ছন্ন প্রতিফলন লক্ষ করা গেলে অবাক হবার কিছু নেই। বাঙালিরাও যে জাতপাতের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে নয়, তার প্রমাণ এ রাজ্যে এ যাবৎ তপসিলি জাতি-উপজাতি বা অন্যান্য অনগ্রসর জাতির কেউ মুখ্যমন্ত্রী হন নি, জাতপাতের ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন বিহারেও যা সম্ভব হয়েছে! প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনকে যুক্তিসিদ্ধ করতে গিয়ে আলোচ্য নিবন্ধে বলা হয়েছে, চাকরিতে সংরক্ষণের মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণীর বৈষয়িক অবস্থার হেরফের ঘটবে না। কারণ 'দেশে চাকুরিই নেই'। বাস্তবেও, সরকারি চাকরির যে অংশ রাষ্ট্রীয় মোর্চা-সরকার ঘোষিত সংরক্ষণের আওতায় পড়েছে, তা দেশের মোট চাকরির মাত্র এক শতাংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংরক্ষণের বিরোধীদের এমন অসুস্থ উদ্বেগ কেন, কেনই বা তাঁরা এই সামান্য-সংখ্যক চাকরির সংরক্ষণে এমন ক্ষিপ্ত এবং কী কারণে অধিকতর কর্মসংস্থানের দাবিতে আন্দোলন করছেন না—যুক্তিহীন, আবেগতাড়িত এই সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবক্তারা তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। অমলবাবুও এ ব্যাপারে মৌন অবলম্বন করেছেন কেন জানতে ইচ্ছে করে। তবে তাঁর এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, তপসিলি জাতি-উপজাতির মানুষ শিক্ষিত ও সংস্কৃত হয়ে উচ্চবর্ণের সাম্রিধ্যলাভের আকুলতায় নিজেদের সমাজ, এমনকী পরিবারের সংস্রবও ত্যাগ করেন। এরকম মন্তব্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, জাতি হিসাবে করা ভুল। সমাজের এক বিরাট অংশকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার জাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে, তাদের অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে হঠাৎ একদিন সমান অধিকারের দোহাই পেড়ে উচ্চবর্ণের কায়েমি স্বার্থ তাদের অন্যদের সাথে এক সারিতে দাঁড় করানোর অভিনয় করে কার্যত তাঁদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতেই চাইছে। এ যেন নিরক্ষর কুলিকে সমান অধিকারের অজুহাতে শিক্ষিত পরীক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসানোর মতো। আমি একজনকে আঘাত করে পঙ্গু করে দিয়ে তাকে বলতে পারি না—দৌড় প্রতিযোগিতায় তাকে অন্যান্য সক্ষম লোকদের সাথে দৌড়তে হবে। সে কোনো বিশেষ সুবিধা পাবে না। যেহেতু সকলের অধিকার সমান। একদিন যাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে শিক্ষাগত সামাজিক ও আর্থিক ভাবে অনগ্রসর করে রাখা হয়েছিল, আজ তাদের অতিরিক্ত সুযোগ দিয়ে শুধু অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, তাদের সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণের সাথে একসারিতে

দাঁড়ানোর অধিকার দিতে হবে। এটা দুঃখজনক যে, অমলবাবুর মতো বুদ্ধিজীবীও উঁচুজাতের কৌশলী সমাজপতিদের অনুকরণে 'আলোচনার মাধ্যমে' দেশের সীমাহীন দারিদ্র্য থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করছেন! এ বিষয়ে গত চুয়াল্লিশ বছরে এত বেশি আলোচনা হয়েছে, এত সময়, এত কাগজের বৃথা অপচয় হয়েছে যে, এখন সব আলোচনা মুলতুবি রেখে কাজের কাজ কিছু করার সময় এসেছে। সর্বদলীয় সম্মেলনে ঐকমত্য করে, কমিটি গঠন করে, পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, দপ্তর চালু করে, অর্থ-বরাদ্দ করে অমল-বাবুর সমাধান-সূত্র কার্যকর করতে গেলে শেষে দেখা যাবে 'পর্বতের মূষিক-প্রসব' হয়েছে। এ ধরনের আলোচনায় কখনোই ঐকমত্য হবে না। হলেও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপোস করতে হবে। কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব নিয়েও মতান্তর ঘটবে, শেষে দেখা যাবে এই করতে গিয়ে সরকারের পতন ঘটেছে এবং নতুন সরকার ঝামেলা এড়াতে 'ব্যয়-সংকোচের' অজুহাত খাড়া করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তুলে দিচ্ছেন! তা ছাড়া, যেখানে তপসিলি জাতি উপজাতিভুক্ত মানুষ ভারতের মোট জনসমষ্টির ২২·৫ শতাংশ হওয়ায়, তাঁদের জন্য ২২·৫ শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত, সেখানে জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ অন্যান্য অনগ্রসর-জাতিভুক্ত হলেও (OBC) মোর্চা-সরকার চাকরির ২৭ শতাংশ তাঁদের জন্য সংরক্ষণ করেন আর দেশের ৭০ শতাংশ মূলত ভূমিজীবী গ্রামীণ জনসাধারণের উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয় বাজেটের ৪৯ শতাংশ অর্থ। তাহলে ৫২ শতাংশ অনগ্রসরের জন্য মাত্র ১৫ শতাংশ বাজেট-বরাদ্দের যৌক্তিকতা কোথায়? অনাবশ্যক ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা-সরনজাম আমদানির খাতে ব্যয় কমিয়ে তাঁদের জন্য ন্যূনপক্ষে ৩০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। এজন্য আলোচনা নয়, আন্দোলনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং আর তাঁর দলের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি এখানেই—তাঁরা তাঁদের বৈপ্লবিক পদক্ষেপের সমর্থনে জনমত সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, এবং এই শোচনীয় ব্যর্থতার মূলে ছিল ক্ষমতাসীন দলগুলির সাংগঠনিক দুর্বলতা। সমগ্র আলোচনার কোথাও অমলবাবু এই বিষয়টির উল্লেখ করেন নি। কিন্তু এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার—ভারতবাসীর মাত্র ১৮ শতাংশ উচ্চবর্ণের মানুষের একটা ক্ষুদ্র অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদতে, মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীকে প্ররোচিত করে ১০০ কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করে দেশ জুড়ে এত বড়ো জাতিদাঙ্গা বাধিয়ে দিল,—অথচ দেশের যে ৭৪·৫ শতাংশ মানুষ সংরক্ষণের আওতায় পড়লেন, তাঁরা নির্বাক হয়ে রইলেন! এমনকী, যাঁদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ, জনসংখ্যার সেই ৫২ শতাংশ মানুষও সরকারি নীতির সমর্থনে সোচ্চার হয়ে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করলেন না! অবশ্যই উচ্চবর্ণ বহু প্রাচীন কাল থেকেই তথাকথিত নীচু জাতের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থসচেতন ও সংগঠিত, কিন্তু জনতা দল তথা রাষ্ট্রীয় মোর্চারও কর্তব্য ছিল সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার আগে মণ্ডল-রিপোর্ট-রূপায়ণের দাবিকে সামনে রেখে অনগ্রসর শ্রেণীকে সংগঠিত করা। পরে অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে জনতা দলের নেতারা বিভিন্ন তপসিলি সংগঠনের সাহায্যে সংরক্ষণের সমর্থনে প্রচার-কর্মসূচী নিয়েছিলেন, কিন্তু আগে থেকেই এ ব্যাপারে পরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্যোগ থাকলে হিংসাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও দূরের কথা, কিছু-সংখ্যক বিত্তবান পরিবারের সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে বুটপালিশ করিয়ে বৃত্তি-বিশেষকে বিদ্রূপ করার ঔদ্ধত্যও উচ্চবর্ণের কায়েমি স্বার্থবাদীদের হত না। ভি. পি.-র দল এ ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে এবং গোটা দেশকেই তার মাশুল গুনতে হয়েছে। এজন্য দেশবাসী জনতা দলকে কখনো ক্ষমা করবে না।

প্রসঙ্গত, "চতুরঙ্গ"-র ওই সংখ্যাতেই প্রকাশিত শ্রীমতী দেবী চ্যাটার্জির "ড. বি. আর. আম্বেদকর, ভারতের পশ্চাৎপদ মানুষ ও মণ্ডল কমিশন" শীর্ষক

প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর আপত্তি প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সে বিষয়ে প্রবন্ধকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভেদনীতির কথা। এটা ভাবা ভুল যে, ব্রিটিশ সরকার অনুন্নত শ্রেণীর প্রতি বঞ্চনার অবসান ঘটাতে বা তাঁদের প্রতি অবহেলায় ব্যথিত হয়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাবে সম্মত হন। সরকারের এই অনুকূল মনোভাবের উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদকে উৎসাহিত করে ভারতীয় সমাজকে শতধাবিভক্ত রাখা, যাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে। গান্ধীজি মূলত, এই কারণেই সেদিন আম্বেদকরের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বের প্রেক্ষাপট ছিল আলাদা, এবং সেই প্রেক্ষাপটেই মহাত্মা গান্ধীর মনোভাবের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

স্বাধীন ভারতেও জাত- ও সম্প্রদায়-গত বিরোধ জিইয়ে রাখতে অনেকেই আগ্রহী, কারণ এর ফলে ভোটের রাজনীতিতে আশাতীত সাফল্য অর্জন করা যায়। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায়, নিজেদের জন্য 'ভোটব্যাঙ্ক' সৃষ্টি করতেই জনতা দল বা রাষ্ট্রীয় মোর্চা মণ্ডল-রিপোর্ট কার্যকর করতে গিয়েছিলেন, এবং ভবিষ্যতেও যদি তাঁরা অনগ্রসর শ্রেণীকে উত্তেজিত করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, রাজনৈতিক নেতৃত্ব দলীয় স্বার্থেও এমন কিছু কাজ করে ফেলেন, সমাজজীবনে যার সুদূর-প্রসারী সুফল পাওয়া যায়।

সুপ্রতীক বাগচী
কলিকাতা-১৯

৪

ভোটযুদ্ধে দেওয়াল লিখন

"চতুরঙ্গ"-র গত মে সংখ্যায় আবদুস সামাদ গায়েনের "ভোটযুদ্ধে দেওয়াল লিখন : বাংলাদেশ" প্রবন্ধটা পড়ে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটের দেওয়াল লিখন সম্বন্ধে কিছু লিখতে ইচ্ছা করছে। ষাটের দশকে বা তার পরে, এমনকী এখনও, কিছু-কিছু ভোটের দেওয়াল-কবিতায় সাহিত্য-গুণ বর্তমান। তা ছাড়া, অনেক প্রতিষ্ঠিত কবির বহুলপ্রচারিত কবিতাকে একটু পরিবর্তন করে ভোটযুদ্ধের সময় দেওয়ালে ব্যবহার করা হয়। এগুলো প্রায় রুচিপূর্ণ থাকে। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে কুরুচিপূর্ণ হতে পারে।

এবারকার সদ্য নির্বাচনে দেখলাম সুকুমার রায়ের "খুড়োর কল" কবিতায় যে ছবি আছে, তা দেওয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে। কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাঁধের উপর "খুড়োর কল"। খাবারের পরিবর্তে সামনে ঝুলছে একটা চেয়ার। তাতে লেখা আছে 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আসন'।

এমন ছবি ভালোই লাগে। এতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাপ থাকে। কিন্তু সাতের দশকে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দেয়ালে আঁকা হয়েছিল ডাইনি হিসাবে। এবারের নির্বাচনে দেওয়ালে আঁকা হয়েছে বানতলার ঘটনা। তাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটা মেয়েকে জোর করে উলঙ্গ করছেন। মুখে তাঁর পৈশাচিক হাসি লটকে দিয়েছে।

সত্তর দশকে ভোটের সময়ে অনেক দেওয়ালে লেখা হয়েছিল—'দুই বাঙলার দুই পশু / ইয়াহিয়া, জ্যোতি বসু।' এবার দেখলাম, লেখা হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গের তিন অপদার্থ / প্রণব, প্রিয়, সিদ্ধার্থ।'

এসব কুরুচিপূর্ণ হাজার-হাজার ছবি বা লেখা পশ্চিমবঙ্গের শহর-গ্রামের শত-শত দেওয়ালে ছড়িয়ে আছে। সেসব আমাদের দীনহীন ও অসংস্কৃত মনের পরিচায়ক।

আবদুস সাহেবের লেখা থেকে জানতে পারলাম বাংলাদেশের মানুষ কতটা গণতন্ত্রকামী। তারা বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দকে সম্মান দিতে জানে। এক কথায় তারা সংস্কৃতিমান।

আর, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কী দেখছি ?

আবদুস সাহেবের লেখাটা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ডান বাম সব রাজনৈতিক নেতাদের ও কর্মীদের শিক্ষা নেবার অনেক কিছু আছে। বিরোধী দল ও নেতাদের যাঁরা সম্মান দিতে জানেন না, তাঁদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ও রুচিমান মানুষের উচিত, যে-কোনো রাজনৈতিক দলের কু-রুচিপূর্ণ ছবি বা দেওয়াল লিখন দেখলে, সংঘবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করা আর মুছে দেওয়া।

লোকেশ বিশ্বাস
কড়ুইগাছি, নদীয়া